Asutosh College Patrika

1949

Professor in charge :

SRI MOHINI MOHAN MUKHERJEE, M. A.

Jt. Editors :

SATYEN MUKHERJEE JAYASREE CHOUDHURY

ASUTOSH COLLEGE LIBRARY
ESTB. 1916

1949.

আশুতোষ কলেজ পত্রিকা

চতুর্বিংশ খণ্ড, প্রথম সংখ্যা
বৈশাখ ১৩৫৬

: যুগ্ম-সম্পাদক :

শ্রীসত্যেন্দ্র নাথ মুখোপাধ্যায়
শ্রীজয়শ্রী চৌধুরী

পন্থা যে অভিনব তাতে সন্দেহ কি? "Western recovery plan"-এর দ্বারা ইউরোপ উপকৃত হলেও, অনুন্নত দেশ বলতে যা বুঝি সেই এশিয়া ও আফ্রিকা এই ডলার-সাম্রাজ্যবাদের প্রশ্রয় দেবে না, এতে আমরা স্থির বিশ্বাসী। ট্রুম্যান সাহেব সত্যি যদি হিতাকাঙ্ক্ষী, তবে নেহেরু-পরিকল্পনা গ্রহণ করতে নারাজ কেন?

•

ডারবানে ভারতীয়দের উপর যে হত্যাকাণ্ড অনুষ্ঠিত হয়েছে তা যথার্থই নৃশংস ও পীড়াদায়ক। মালান সরকারের বর্ণ-বিদ্বেষ নীতির ফলেই যে উক্ত রূপ নৃশংসতা অনুষ্ঠিত হয়েছে একথা তার প্রতিদ্বন্দ্বী জেনাঃ স্মাটস্ পর্য্যন্ত স্বীকার করেছেন। ডারবানের ঘটনা বর্ণ-বিদ্বেষ প্রচারকদের অন্ধমনের উপরে আলোকসম্পাত করলেই আমরা শান্তি লাভ করব।

•

হায়দ্রাবাদে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। দীর্ঘকাল ধরে সংগ্রাম পরিচালিত করে হায়দ্রাবাদের জনসাধারণ অবশেষে স্বীয় ভুল বুঝতে পেরেছে। ব্রিটিশ রাজত্বের যবনিকা পাতের সঙ্গে তাদেরও যে সুখ-নিদ্রার ব্যাঘাত ঘটবে একথা দেশীয় নৃপতিগণ বিশ্বাস করতে পারেন নি।

•

কয়েক মাস ধরে বিস্তৃত আলোচনা ও পর্য্যবেক্ষণের পরে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ কর্তৃক নিয়োজিত "কাশ্মীর কমিশন" তাদের রিপোর্ট দিয়েছেন। বর্ত্তমান কাশ্মীর নিয়ে দুটি ডোমিনিয়নের মধ্যে একটি অস্থায়ী চুক্তি সম্পাদিত হয়েছিল সত্য, কিন্তু পাকিস্তান গতানুগতিক ভাবে কাশ্মীর রাজ্যবিভাগের দাবী জানিয়েছে। শের-ই-কাশ্মীর, শেখ আব্দুল্লা এক বক্তৃতা প্রসঙ্গে বলেছেন: "জাতীয়তাবাদী কাশ্মীর ও তাহার জনসাধারণ কোন কারণেই এই বিভাগ স্বীকার করিবে না।" আমরাও শের-ই-কাশ্মীর-এর কথার প্রতিধ্বনি তুলি।

•

ডাচ্ সাম্রাজ্যবাদ পুর্বচুক্তি ভঙ্গ ক'রে ইন্দোনেশিয়ার জাতীয়তাবাদী আন্দোলনকে আবার আঘাত করেছে। সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ কেবলমাত্র একটি প্রস্তাব গ্রহণ করেই নিশ্চেষ্ট হ'য়ে বসে আছে। আটল্যান্টিক চুক্তি গ্রহণ করায় বোঝা যায় ইংলণ্ড ও আমেরিকা তোষণ-নীতির অনুসরণ ক'রেছে। পণ্ডিত নেহরুর নেতৃত্বে দিল্লীতে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার জাতিপুঞ্জের অধিবেশনে ইন্দোনেশিয়ার স্বপক্ষে যে প্রস্তাব গৃহীত হয়, তা আজও কার্য্যকর হয়নি। আমরা মনে করি নিরপেক্ষ দর্শকরূপে এবং প্রস্তাব গ্রহনের দ্বারা সময় নষ্ট না ক'রে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার জাতিপুঞ্জ কর্তৃক ইন্দোনেশিয়াকে একটি সক্রিয় সাহায্যদান করা উচিত।

•

যে সমস্ত সমস্যা জাতিদেহকে অক্টোপাসের মত কবলিত করেছে তার মধ্যে খাদ্য ও বস্ত্র সমস্যাই প্রধান। শুধু মাত্র ভারতবর্ষের নয়, সমস্ত জগতেরই এ দুটি সমস্যা। অন্যান্য স্বাধীন রাষ্ট্রগুলি এ সমস্যার আংশিক সমাধান করেছে, কিন্তু ভারতবর্ষ আজ পর্য্যন্ত কোন আশানুরূপ ফল প্রসব করতে পারে নি। এজন্য দোষী যে কেউ নয়, একথা বলা চলে না। দেশের অর্থনৈতিক অবস্থা যে জটিল আকার ধারণ করেছে তার মধ্য হতে দ্রুত ফলপ্রাপ্তির কোন বিশেষ সম্ভাবনা নেই। সমস্যার সমাধানের জন্য প্রয়োজন সুষ্ঠু পরিকল্পনা ও সক্রিয় সহযোগিতা।

•

মুদ্রাস্ফীতি বন্ধ করার উদ্দেশ্যে সরকার পক্ষ থেকে যে পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে, তার মধ্যে নূতন কর স্থাপন প্রধান। সরকারের প্রধান দুটি আয়ের উপায় "কাষ্টম" ও "আয়কর"। দেশের ধনী সম্প্রদায় যে এই নতুন কর স্থাপনে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে একথা বলা চলে না (?)। অপর দিকে দৈনন্দিন ব্যবহারের সাধারণ দ্রব্যাদির উপর যে কর স্থাপন হয়েছে তা জনসাধারণের পক্ষে বহন করা দুঃসাধ্য হয়ে উঠেছে।

আমরা সরকারকে এ বিষয়ে সচেতন হবার জন্য আবেদন জানাচ্ছি।

*

শিক্ষার সমস্যার আশু সমাধান প্রয়োজন হয়ে পড়েছে। আজকের ছাত্রসমাজ আগামীকালের নাগরিক। দেশের প্রকৃত উন্নতি সাধনে প্রয়োজন জাতীয় শিক্ষা। পৃথিবীর অন্যান্য দেশের সঙ্গে তুলনা ক'রলে আমাদের মেডিকেল, ইন্‌জিনিয়ারিং, ও টেকনিক্যাল বিষয়ে অভিজ্ঞ ব্যক্তির একান্ত অভাব। আবার দেশের শাসন কার্য্য পরিচালনার জন্য অভিজ্ঞ ব্যক্তিরও অভাব রয়েছে। একমাত্র সুষ্ঠু জাতীয় শিক্ষা পরিকল্পনা এ সমস্যা সমাধান করতে পারে। পুঁথিগত শিক্ষার সঙ্গে বৃত্তির উপযোগী ব্যবহারিক শিক্ষা প্রদানের—পরিকল্পনা "বুনিয়াদী শিক্ষার" মধ্যে ব্যক্ত হয়েছে।

*

"ইউনিভারসিটি এডুকেশন" নিয়ে অনুসন্ধান ও তথ্য সংগ্রহে ব্যাপৃত আছেন "ইউনিভারসিটি কমিশন"। মাননীয় সভ্যগণ আমাদের কলেজ সংপ্রতি পরিদর্শন করে গেছেন।

কমিশনের উদ্দেশ্য হলো কি উপায়ে বিশ্ববিদ্যালয় অথবা উচ্চশিক্ষাকে সাফল্যমণ্ডিত করা যায়। বিশ্ববিদ্যালয় যে গতানুগতিক পদ্ধতিতে শিক্ষা দান করে চলেছে, তার মধ্যে প্রয়োজন এক বৈপ্লবিক পরিবর্তন। বিশ্ববিদ্যালয়ের বর্ত্তমান পরীক্ষা-গ্রহণ-নীতির ফলে উদ্ভব হচ্ছে নানা অপ্রীতিকর ঘটনা। সংবাদপত্রে প্রায়ই দেখা যায় কোন "ইন্‌ভিজিলেটর" ছাত্রদল কর্তৃক প্রহৃত হয়েছেন। পরীক্ষার ফল যখন বেরয়, দেখা যায় শতকরা প্রায় চল্লিশ (৪০) থেকে ষাট (৬০) জন ছাত্র অকৃতকার্য্য হয়েছে। এ সমস্ত অভিজ্ঞতা থেকে আমাদের মনে হয় সম্পূর্ণ শিক্ষা পরিকল্পনা নতুন দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে প্রস্তুত করা প্রয়োজন। কেন ছাত্র অকৃতকার্য্য হবে? সে দায়িত্ব কার? লোকমান্য তিলকের কথার "Education can wait, but Swaraj cannot" ছাত্রসমাজ একদিন প্রতিধ্বনি তুলেছিল। আজ স্বাধীন ভারতে আমরা শিক্ষামন্ত্রী মৌলানা আজাদের কথার "Education can brook no delay" প্রতিধ্বনি তুলছি। বিশৃঙ্খলা বিশ্ববিদ্যালয়ের অগ্রগতিকে প্রতিহত করছে। আমরাও ছাত্রসমাজ, শিক্ষকমণ্ডলী, কর্তৃপক্ষকে যুক্তভাবে অনুরোধ জানাচ্ছি এ বিষয়ে তাঁরা যেন সচেতন হন। কমিশনের চেয়ারম্যান ডাঃ রাধাকৃষ্ণণ এ বিষয়ের উপর বলেছেন: "It is essential therefore, that our universities should see to it that the graduates turned out by them are really people, who are imbued with at least a little of the spirit, which this country has always stood, a country which has been famous in every one of its generations for its good people." সমস্যার সমাধানের জন্য প্রয়োজন প্রত্যেক দলের মধ্যেই সক্রিয় সাহায্য এবং এসঙ্গে আমরা অন্যান্য দেশের মত সেনেট, সিণ্ডিকেট, প্রভৃতিতে ছাত্র প্রতিনিধি রাখবার অনুরোধ জানাচ্ছি। আমাদের প্রস্তাব কল্পনাপ্রসূত নয়, বরং অভিজ্ঞতা, পারিপার্শ্বিক অবস্থা বিবেচনা করে এ বিষয়ে চিন্তাশীল ব্যক্তিগণও যে একমত হবেন আমরা এ বিশ্বাস পোষণ করি।

*

শান্তি ও প্রীতির বুলিতে ভুলে অনেক কিছু প্রত্যাশা করে বৃটিশ রাজের মুখ চেয়ে বসেছিল ভারতের জনসাধারণ, তাদের প্রত্যাশার উপর চরম আঘাত হেনে ভারতবাসীর গলার ওপর পা দিয়ে দাঁড়ালো 'রাউল্যাট আক্ট'। কিন্তু ৬ই এপ্রিল ভারতবাসী জাতীয় জনকের নেতৃত্বে ঝাঁপিয়ে পড়ে এ অন্যায়ের বিরুদ্ধে। তারা সত্যাগ্রহী, সরকারী ভাড়াকরা বৃটীশ গুণ্ডারা সেদিন তাদের কণ্ঠরোধ করতে চেয়েছিল, তবুও ঐ সত্যাগ্রহী যোদ্ধাদের সঙ্কল্পচ্যুত করতে পারেনি। ...আজও আবার সেই ৬ই এপ্রিলের পুনরাবৃত্তি দেখছি মানভূমের গ্রামে গ্রামে। এখানেও প্রায় সেই একই অত্যাচার, একটা

লোককে তার মাতৃভাষায় কথা বলতে দেবেনা। স্বার্থের খাতিরে সত্যের সংজ্ঞা হয়তো আজ পালটিয়ে গেছে অনেকের কাছে। তবুও সংগ্রামী জনসাধারণের কাছে আমাদের আবেদন জানাই, সত্য ও ন্যায়ের আদর্শকে সুপ্রতিষ্ঠিত করতে না পারলে গান্ধীজির আদর্শ ভারতকে আর খুঁজে পাওয়া যাবে না। শ্রীঅতুল ঘোষ প্রমুখ সত্যাগ্রহীদের জানাই আমাদের আন্তরিক সহযোগ। মানভূমে তাঁদের আদর্শকে সুপ্রতিষ্ঠিত করতে আমরা সর্বশক্তি ব্যয় করবো।

•

গত ১৫ই এপ্রিল পশ্চিমবঙ্গ কলেজও বিশ্ববিদ্যালয় অধ্যাপক সম্মেলনের চতুর্বিংশ অধিবেশনে আমাদের কলেজের দিবা-বিভাগের অধ্যক্ষ শ্রীসোমেশ্বরপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় মহাশয় সভাপতির অভিভাষণে বর্ত্তমান শিক্ষা ব্যবস্থার পর্য্যালোচনা কালে বলেন যে বর্ত্তমান শিক্ষা-পদ্ধতির প্রতিকূল সমালোচনা প্রায় সকলের মুখেই শোনা যায় কিন্তু আমাদের অসহিষ্ণু না হ'য়ে উন্নততর শিক্ষা প্রণালী উদ্ভাবিত হলেই সানন্দে তা গ্রহণ করা উচিত। সরকার আর্থিক সাহায্য করলে আমাদের আন্তরিক কর্মপ্রচেষ্টা দ্বারা নিশ্চয়ই আমরা উন্নততর শিক্ষা প্রণালী উদ্ভাবন করতে পারব। অতঃপর প্রাথমিক, মাধ্যমিকও উচ্চতর শিক্ষা প্রণালীর বিশ্লেষণ কালে তিনি বলেন শালীনতা ও সৌজন্য বোধের অভাব ছাত্রদের অধ্যয়নে চূড়ান্ত বাধার সৃষ্টি করে। তিনি প্রাথমিক শিক্ষা গ্রহণের কাল নির্দ্দিষ্ট না করে শিক্ষার্থীর বুদ্ধি ও প্রয়োজন অনুসারে হ্রাস বৃদ্ধি করার পক্ষপাতী। শারীর শিক্ষার দিকেও তিনি সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। শরীর চর্চায় শরীরের উৎকর্ষ সাধনের সঙ্গে সঙ্গে মানসিক স্থৈর্য্য বাড়ায়, শৃঙ্খলাবোধ জাগরিত এবং নৈতিক দৃষ্টি সম্প্রসারিত করে।

এই প্রসঙ্গে উচ্চশিক্ষার মাধ্যম সম্পর্কে প্রাদেশিক ভাষা সমুদয়ের মধ্যে বাংলাকেই তিনি শ্রেষ্ঠ আসন দান করেন। তবে তাঁর মতে বাংলা যাতে অধিকতর সমৃদ্ধি লাভ করতে পারে সে দিকে দৃষ্টি রেখে অতি প্রচলিত ও সহজবোধ্য বিদেশী শব্দাবলীকেও গ্রহণ করা উচিত।

পশ্চিমবঙ্গে কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকদের অবস্থা মর্মান্তিক। তাঁরা যে পারিশ্রমিক পান তাতে স্ত্রী, পুত্র পরিজনের বস্ত্রেন্ধন সংগ্রহ করাই প্রায় অসম্ভব। অধ্যাপক সম্প্রদায়কে এই হাস্যকর মাগ্‌গী ভাতা দিয়ে তাঁদের দাবী মেটাবার চেষ্টা না করে এদিকে একটু স্থির মস্তিষ্কে চিন্তা করতে হবে। নইলে সমবেতভাবে তাঁরা এর প্রতিবাদ জানাবেন। শিক্ষকমহাশয়দের এই ন্যায্য দাবীর সঙ্গে গলা মিলিয়ে আমরাও জানাই এ দিকে উদাসীন থাকলে সমগ্র ছাত্র সমাজও এ অন্যায়ের বিরুদ্ধে দাঁড়াবে।

•

আমাদের কলেজের বাংলা সাহিত্যের অধ্যাপক শ্রীবিজন বিহারী ভট্টাচার্য্য মহাশয় ৺ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায়ের "কঙ্কাবতী" নামক হাস্যরসাত্মক উপন্যাসের গবেষণা করে এ বছর কলকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের নব-প্রবর্ত্তিত D. Phil.-উপাধি লাভ করেছেন। তাঁকে আমাদের সশ্রদ্ধ অভিনন্দন জ্ঞাপন করছি।

•

এ বছরের কলেজ পত্রিকা সম্পাদনার অভিজ্ঞতা থেকে বলতে পারি, ছাত্র-ছাত্রীদের রচনায় দোষ ত্রুটি থাকা সত্ত্বেও অনেকের লেখার মধ্যে একটা স্বাভাবিক বলিষ্ঠতা ও শিল্পচেতনা লক্ষ্য করেছি। সাধনা করবার সুযোগ পেলে ভবিষ্যতে তাদের কাছ থেকে অনেক কিছু আশা করতে পারি। তাদের এ শিল্পী মনের উৎকর্ষ সাধনের জন্য যে সুযোগ-সুবিধার প্রয়োজন তা কলেজে যতটা পাওয়া সম্ভব ততটা আর কোথাও নয়। কলেজে বিদ্যাভ্যাসের সঙ্গে সঙ্গে সামাজিক, মানসিক, শারীরিক ও রুচিগত উন্নতি লাভ করবার অধিকার আছে। এবং

তার ব্যবস্থাও আছে। কিন্তু তার জন্য ছাত্রদের ও কর্তৃপক্ষের সমান উৎসাহী হওয়া প্রয়োজন। কলেজে প্রত্যেক কাজে বিপুল সংখ্যক ছাত্রদের মাঝে যে সহযোগিতা আশা করা যেতে পারে অন্য কোথাও তা পাওয়া সম্ভব নয়। কলেজে বিতর্ক সভা, সাহিত্য চর্চা, খেলাধূলা শরীর চর্চার যে আয়োজন আছে ছাত্রদের তাতে অধিকতর উৎসাহী হওয়া প্রয়োজন। কলেজে যে "Chemical Association" প্রভৃতি গঠিত হয়েছে ছাত্রদের সক্রিয় সহযোগিতা পেলে তার উন্নতি অবশ্যম্ভাবী। বাংলা সাহিত্য সমিতি রবীন্দ্র-সাহিত্য আলোচনার যে পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে তাতেও ছাত্রদের পূর্ণ সহযোগিতা একান্ত কাম্য। প্রাচীর-পত্র মারফৎ সাহিত্য ও শিল্পকলা চর্চার যে ব্যবস্থা রয়েছে তার মধ্য দিয়েই আমাদের শিল্পীর শিল্পচর্চার মান বৃদ্ধি করা সম্ভব।

ছাত্রদের কাছে আমার আবেদন তাঁরা যেন উৎসাহী হয়ে কৃষ্টিগত উন্নতির প্রত্যেক ক্ষেত্রে নিজেদের দৃষ্টি রাখেন এবং তাহাদের সহযোগিতা দ্বারা আমাদের প্রত্যেকটি কর্মপ্রচেষ্টা সাফল্যমণ্ডিত করেন। তবে আমাদের আশার কথা এই যে খেলাধূলা ও শরীর চর্চার সঙ্গে সাহিত্য ও শিল্পের পরিধি ক্রমশই বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং ছাত্রছাত্রীগণও ক্রমশঃ এ বিষয়ে সচেতন হ'য়ে উঠছেন।

•

•

গ্রীষ্মসংখ্যা পত্রিকা বাহির হইল। পুরাতন সম্পাদকেরা বিদায় লইয়াছেন—তাঁহাদের স্থলে আমরা নির্বাচিত হইয়া কার্য্যভার গ্রহণ করিলাম। আশা করি সহযোগীবৃন্দের কর্মকুশলতায় আমাদের দোষত্রুটি মার্জিত হইবে।

প্রথমেই যেকথা আমাদের মনে আসিতেছে তাহা দুরপনেয় শোকের কথা। মাতৃসমা সরোজিনী নাইডুকে আমরা কিছুদিন পূর্ব্বে হারাইয়াছি। জগতের মুখোজ্জল-

নানা কারণে এবারও পত্রিকা প্রকাশ করতে একটু দেরী হয়ে গেল। বিশেষত ছাপার গণ্ডগোলে আমাদের কাজ এগুতে পারেনি। এতে আমার সম্পাদকীয়তে লেখা অনেক ঘটনা পুরণো ঠেকবে। তবে আর এক সংখ্যা পত্রিকা প্রকাশ করার ইচ্ছা আছে। ছাত্রদের সহযোগিতা কামনা করি। কয়েকটি কারণে সান্ধ্য-বিভাগের পত্রিকা এবার পৃথকভাবে প্রকাশিত হবে।

•

আমাদের কলেজে সাহিত্যানুরাগী ছাত্র ছাত্রী অনেক আছেন, কারণ এবার পত্রিকার জন্য সংখ্যায় অনেক লেখাই পেয়েছি। কিন্তু মৌলিকতার দিকে লক্ষ্য রাখবার জন্য এত চেঁচামেচি করা সত্বেও অনেক লেখাতে ঐ জিনিষটারই সবচেয়ে অভাব লক্ষ্য করলাম। আমাদের কলেজে বিজ্ঞানের ছাত্র ছাত্রী অনুপাতে বেশী হলেও দু'একটির বেশী বিজ্ঞান সম্বন্ধীয় প্রবন্ধ পাইনি, যদিও এ বিষয়ে ছাত্রদের আমি অনুরোধ জানিয়েছিলাম। আগামী বারের পত্রিকায় লেখা দেবার সময় ছাত্ররা যেন এদিকে একটু দৃষ্টি রাখেন। আর একটা কথা: নির্দ্ধারিত সময়ের মধ্যে হিন্দি লেখা পাওয়া যায়নি। এজন্য এবার হিন্দি লেখা প্রকাশ করা সম্ভব হলো না।

শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

কারিণী বঙ্গললনাকুলরত্নদিগের শীর্ষভাগে থাকিয়া যিনি স্বদেশের মুখ উজ্জ্বল করিয়াছিলেন সেই অম্লান প্রাণ নিবিয়া গিয়াছে। ভারতের কোকিলকণ্ঠী মহিলা কবির কণ্ঠ চিরতরে নীরব হইয়া গিয়াছে। প্রদীপ্ত আশা ও চিরানন্দময় বাণী আর আমরা শুনিতে পাইব না—তিনি আমাদের কি ছিলেন রাজনীতি ও সমাজ জীবনে তাঁহার দান কতটুকু সেকথা আলোচনা বাহুল্য মাত্র। কেবল আমরা কায়মনোবাক্যে অনুভব করিতেছি তাঁহাকে আজ

আমাদের বড় প্রয়োজন ছিল। বিভ্রান্ত, বিচ্যুতকর্তব্য, ও স্বাধীনতা লাভে বিপর্যস্ত বাঙ্গালী জাতিকে আজ তাঁহার আলাময়ী বাণী সঞ্জীবিত করিতে পারিত। ছাত্র সমাজ ও শিশুদল তাঁহার প্রিয় ছিল। তাঁহার আশা ও স্বপ্নে যে বলিষ্ঠ বাঙ্গালী জাতির কামনা নিহিত ছিল তাহাই আপনাদের মধ্যে চরিতার্থতা লাভ করুক।

•

অন্যতম নেতা ও সমাজসেবী কিরণশঙ্কর রায়ের মৃত্যুও আমাদিগকে অভিভূত করিয়াছে। বাঙ্গালী জাতির রাজনীতি ক্ষেত্রে তাঁহার ক্ষতি অনেক।

•

আজ ছাত্র সমাজের বড় দুর্দিন। আমরা আমাদের দায়িত্ব ভুলিয়া গিয়াছি কর্মের নিষ্ঠাহীনতায়। চিন্তার অপ্রতুলতায় অকাল বার্দ্ধক্যে আমরা পঙ্গু। হইতে পারে দেশের সংকটকাল এখন চরমে উপস্থিত হইয়াছে, কিন্তু আমাদের বলিষ্ঠতাহীন স্বকীয়তায় সেই ভাঙ্গনকে আমরা কেন বাড়াইতেছি, রাজনীতির বিকৃতি ছাত্র-জীবনের অস্থিমজ্জাকে পীড়িত করিতেছে—আমাদের কর্তব্য ফাঁকির হাওয়ায় উড়িয়া যাইতেছে। জানি, এইদিন থাকিবেনা কোন দুর্দিনই স্থায়ী নয়। আমাদের সম্মিলিত প্রচেষ্টা স্বদেশের বুকে আশার বর্ত্তিকা জ্বালাইয়া তুলুক—শোকাচ্ছন্ন, সংকটাচ্ছন্ন পরিবেশে ছাত্রজীবনের দুরূহ কর্তব্যের পথ রচনা হোক।

ছাত্রদের কাছে দেশের আশা অনেক।

যদিও আমাদের পথ কণ্টকসঙ্কুল, টিয়ারগ্যাস লাঠি পুলিশের সহিত আজও আমরা একমত হইতে পারি নাই—শিক্ষার পথ দুস্তর বাধায় আবদ্ধ, তথাপি দেশ আমাদেরই মুখ চাহিয়া আছে। শত বিপদের উত্তাল তরঙ্গ ভেদ করিয়া আমরাই ভবিষ্যতের বুকে জয়ধ্বজা আরোপণ করিতে পারি। কিন্তু আমরা শিথিলকর্তব্য, পাঠ্যপুস্তকের বোঝায় ভারাক্রান্ত। সুস্থ জীবনদর্শন বৃহত্তর আশা আকাঙ্খা আমাদের চোখে কোন মোহাঞ্জন লাগাইতে পারে নাই।

কবি কি আমাদের উদ্দেশে বলেন নাই

"ওরে সবুজ ওরে আমার কাঁচা
আধমরাদের ঘা মেরে তুই বাঁচা—।"

যৌবনের সেই শ্যামল সৌন্দর্য্য আমাদের কোথায়? নৈতিক জীবনের চরম অবনতিতে, শিক্ষার বিকৃত পন্থায়, ভবিষ্যৎ কর্তব্য নির্দ্ধারণের অসামর্থ্যে তাহার রঙরস শুকাইয়া গিয়াছে। ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে সম্মিলিত প্রচেষ্টা ও সাহিত্যসুলভ অকৃত্রিম মনোবৃত্তি দিয়া সেই শ্যামলতাকে ফিরাইয়া আনিতে হইবে। আমরা প্রত্যেকে দেহে মনে সত্যাগ্রহী হইব—সত্যের সন্ধানে আমাদের ছাত্রজীবন উৎসর্গীকৃত হউক। নৈতিক অবনতি, মিথ্যা ও বিকৃত চিন্তার কোন স্থান সেখানে থাকিবেনা।

জয়শ্রী চৌধুরী

শব্দাতীত তরঙ্গ

শ্রীকান্তি পদ চট্টোপাধ্যায়
তৃতীয় বর্ষ, বিজ্ঞান

মানুষের কৌতূহল এবং জ্ঞান লাভ করিবার আগ্রহ মিটাইতে গিয়া বিজ্ঞানের কলেবর ক্রমশই বিস্তার লাভ করিতেছে। আমি সেই পরিবর্দ্ধিত কলেবরের সামান্ত একটি অংশ সম্বন্ধে কয়েকটি কথা বলিব।

আমরা জানি যে, বায়ুতে চাপের ক্রমপর্য্যায় পরিবর্ত্তনের ফলে শব্দ তরঙ্গের সৃষ্টি হয়। ইহা ঈথিরীয় কম্পন হইতে উদ্ভূত তরঙ্গ হইতে সম্পূর্ণ পৃথক। ঈথিরীয় কম্পনের মধ্যে পড়ে, সাধারণ আলো, রঞ্জন-রশ্মি, অতি বেগুনী বা রঙ্গোত্তর রশ্মি (Ultraviolet radiation), বেতার তরঙ্গ ইত্যাদি এবং এই সমস্ত ঈথিরীয় কম্পনোদ্ভূত রশ্মিগুলি শূন্যতার মধ্য দিয়া যাইতে পারে। কিন্তু শব্দ তরঙ্গ পারে না। মানুষের শ্রুতি-গ্রাহ্য ক্ষিপ্রতর কম্পনমাত্রার অতীত শব্দ তরঙ্গকে (High frequency wares) নীরবশব্দ বা শব্দহীন শব্দ বলা হয়। উপরোক্ত শব্দ তরঙ্গকে ইংরাজীতে প্রথমে Supersonic বলা হইত, পরে হইাকে Ultra-sonic নামে অভিহিত করা হয়। শব্দ তরঙ্গের গতিবেগ অপেক্ষা দ্রুততর গতিবেগ সম্বন্ধেই "Supersonic" কথাটি এখন ব্যবহৃত হয় (ঘণ্টায় ৭৪০ মাইলের উপর)। যেমন, নবাবিষ্কৃত অতিবেগসম্পন্ন জেট্ (jet) চালিত বিমানের গতিবেগকে কখনো কখনো "Supersonic" বলা হয়। এই জেট্-চালিত বিমানের গতিবেগ ঘণ্টায় ১০০০ মাইলেরও অনেক বেশী হইবার সম্ভাবনা আছে। কিন্তু শ্রুতি-গ্রাহ্যের অতীত উচ্চ কম্পনমাত্রা বিশিষ্ট শব্দ তরঙ্গ সম্পর্কেই "Ultrasonic" কথাটি ব্যবহৃত হয়।

শব্দ তরঙ্গ কম্পনমাত্রা সেকেণ্ডে ২০,০০ এর অধিক হইলে, মানুষ তাহা শুনিতে পায় না। অবশ্য বয়সের সঙ্গে শব্দ শুনিবার ক্ষমতা ক্রমশঃ কমিয়া যায়। বহুদিন পূর্বে "গ্যাল্টন্" (Galton) তাঁহার শব্দযন্ত্র দ্বারা পরীক্ষা করিয়া দেখেন যে মানুষের শ্রুতির অগোচর শব্দ কুকুরে শুনিতে পায়। সম্প্রতি "হারট্রিজের" পরীক্ষার দ্বারা জানিতে পারা গিয়াছে যে, বাদুড় জাতীয় পক্ষীদের "Ultrasonic" তরঙ্গ প্রেরণ ও গ্রহণ করিবার ক্ষমতা আছে এবং কেবলমাত্র ইহারই সাহায্যে উহারা অন্ধকারে সম্মুখের বাধার উপস্থিতি পূর্বেই জানিতে পারে। সাধারণতঃ মানুষের ধারণা যে, বাদুড়েরা অন্ধকারে দেখিতে পায় বলিয়া গভীর অন্ধকারে সহজে উড়িতে পারে।

যে কোন বস্তুকে যথাযথভাবে স্পন্দিত করিয়া, "Ultrasonic" তরঙ্গ তৈয়ারী করা যাইতে পারে। সাধারণ বলপ্রয়োগের সাহায্যে অথবা পিজো (Piezo) তড়িৎ-শক্তির সাহায্যে অথবা চুম্বক শক্তির সংকোচনের সাহায্যে "শব্দাতীত" (Ultrasonic) তরঙ্গ উৎপন্ন করা যায়। স্ফটিকের (quartz) উপর অত্যধিক চাপ দিলে, উহার মধ্যে যে বৈদ্যুতিক শক্তির প্রকাশ হয়, উহাকেই পিজো (Piezo) বিদ্যুৎ বলে। ইহার ঠিক বিপরীত ভাবে বলা যাইতে পারে যে, যখন স্ফটিকের মধ্যে পরবর্ত্তী বিদ্যুৎ প্রবাহ (alternating current) সঞ্চালিত করা হইবে, তখন উহার মধ্যে স্পন্দন আরম্ভ হইবে। চুম্বক শক্তির সংকোচনের উদাহরণ স্বরূপ বলা যাইতে পারে যে, যখন একটি নিকেল দণ্ড পরবর্ত্তী চুম্বক প্রভাবান্বিত ক্ষেত্রে (alternating magnetic field) স্থাপিত করা যায় তখন উহা পর্য্যায় ক্রমে প্রসারিত ও সংকুচিত হইতে থাকে। উপরোক্ত যে কোন একটি পন্থার

সাহায্যে প্রতি সেকেণ্ডে ১২,০০,০০০ কম্পনমাত্রা বিশিষ্ট "শব্দাতীত" তরঙ্গ উৎপন্ন করা যাইতে পারে। শব্দাতীত তরঙ্গ আশ্চর্য্যজনকভাবে বিভিন্ন ক্ষেত্রে প্রযোজিত হইতে পারে। সমুদ্রগর্ভে অবস্থিত সাবমেরিনের (Submarine) অবস্থিতি নির্ণয়ে ইহার প্রয়োগ অন্যতম। কোন স্থান হইতে প্রতিধ্বনি ফিরিয়া আসিতে যে সময় লাগে, সেই সময়ের সাহায্যে ঐ স্থানের দূরত্ব পরিমাপ করা যায়। এই উপায়ে নিমজ্জিত সাবমেরিনের দিকে শব্দ-তরঙ্গ প্রেরণ করিয়া তাহার দূরত্ব নির্ণয় করা যায়। কিন্তু সেই শব্দ তরঙ্গ হইতে উদ্ভূত ধ্বনি সাবমেরিনের অভ্যন্তরস্থ লোকদিগের শ্রুতি-গোচর হইতে পারে। "শব্দাতীত" তরঙ্গ প্রেরণ করিয়া ইহার প্রতিধ্বনি করা যায়। অবশ্য সাবমেরিনে সেই বিশিষ্ট মাত্রার তরঙ্গ ধরিবার ব্যবস্থা যদি না থাকে, এই প্রক্রিয়া রেডারের (Radar) প্রক্রিয়া হইতে সম্পূর্ণ-রূপে পৃথক। কারণ, রেডার বৈদ্যুতিক তরঙ্গের সাহায্যে অনুরূপ উপায়ে কার্য্য করে। "শব্দাতীত" তরঙ্গের সাহায্যে সমুদ্রের মধ্যে নিমজ্জিত মাইন প্রভৃতি বিস্ফোরক পদার্থের সন্ধান করা যায়। শিল্পক্ষেত্রেও এই তরঙ্গের বহুল ব্যবহার আছে, যেমন ধাতুর শুদ্ধতা নির্ণয় এবং বাহির হইতে বৃহৎ জলাধারের অভ্যন্তরস্থ জলের উচ্চতা পরিমাপের জন্য।

এই "শব্দাতীত" তরঙ্গ তরল পদার্থের মধ্যে চালিত করিলে যে তীব্র আলোড়ন সৃষ্টি করে, তাহাকে বিভিন্ন প্রয়োজনীয় কার্য্যে ব্যবহার করা হইয়াছে ও হইতেছে। ১৯৩২ খ্রীষ্টাব্দে জে, আর, কেয়ঁ (Quain) সর্বপ্রথম তীব্র আলোড়নের সাহায্যে তরল অথবা কঠিন পদার্থকে জীবাণুমুক্ত করিবার একটি প্রক্রিয়ার প্যাটেণ্ট লইয়াছিলেন। ইহার পর হইতে চিকিৎসা বিজ্ঞানে "শব্দাতীত" তরঙ্গের ব্যবহার ক্রমশঃ বাড়িতে থাকে। অনেকে মনে করেন যে এই উপায়ে ব্যাক্টিরিয়া, ভাইরাস, প্রোটোজোয়া, ঈষ্ট, প্রভৃতি জীবাণু ধ্বংস করিবার কার্য্যে, ম্যালেরিয়া নির্মূল করিবার জন্য মশার ডিম ধ্বংস করিতে, ময়লা পোষাক পরিচ্ছদ পরিষ্কৃত করিতে (অবশ্য ইহাতে পোষাক পরিচ্ছদেরও নষ্ট হইবার সম্ভাবনা আছে), ফোটোগ্রাফ প্লেটের ইমাল্‌সান্ তৈয়ারী করিতে ইহা ব্যবহার করা যাইতে পারে। প্রসাধন দ্রব্য উৎপাদনে ও দুগ্ধকে সমসত্ত্ব (homogeneous) করিতে ইহা ব্যবহার করা হইয়াছে। বায়ুর মধ্যে ভাসমান সূক্ষ্ম ধূলিকণা-সমূহ এই তরঙ্গের সাহায্যে সহজেই অপসারিত করা যায়। এই উপায়ে ধূম অপসারণ ও কুয়াশা নিবারণ স্বল্পব্যয়ে করা গিয়াছে। বধিরতা, হাঁপানী, সায়াটিকা এবং অন্যান্য স্নায়বিক রোগে ইহা ব্যবহার করিয়া সুফল পাওয়া গিয়াছে, রোগ নির্ণয়ের ব্যাপারেও ইহা প্রয়োগ করা হইয়াছে।

"শব্দাতীত" তরঙ্গের শক্তি কম্পনমাত্রার আনুপাতিক, অর্থাৎ কম্পনমাত্রার বৃদ্ধির সহিত তরঙ্গের শক্তি বাড়িয়া থাকে। কম্পনমাত্রা বাড়াইয়া ইহার শক্তি এরূপ তেজ-সম্পন্ন করা যায় যে, ইহার প্রয়োগে কিছুদূর হইতেই সিগারেট প্রজ্বলিত করা এবং এক পাত্র জলকে ফুটান সম্ভব হইয়াছে। ইহার শক্তি আরও বাড়াইয়া এরূপ অবস্থায় আনা যায় যে, ইহাকে তখন "মৃত্যু-রশ্মি" (Death ray) হিসাবে ব্যবহার করা যাইতে পারে।

এইরূপ শোনা যায় যে, গত মহাযুদ্ধে অষ্ট্রীয়ার বৈজ্ঞানিকগণ এমন একটি "শব্দাতীত" মারণাস্ত্র (Ultrasonic gun) প্রস্তুত করিয়াছিলেন যাহা দ্বারা ৬৫ গজ দূর হইতে মানুষকে মারিয়া ফেলা যাইত এবং ৩০০ গজ দূর হইতে তাহাকে অকর্মণ্য করা যাইত।

Council of the Ashutosh College Students Union.

DAY-DEPARTMENT—1948-49

Sitting : (From Left)—Dipen Chatterjee (Common-Room Secretary), Sunil Das (Mamu) (Assistant General Secretary), Kamal Ghose (General Secretary), Professor Sambhu Nath Banerjee (President), Principal Someswarprosad Mukherjee, Rabindra Nath Mukherjee, (Vice-President), Satyen Mukherjee, Animesh Roy Chowdhury (Assit. Games Secretary), Amal Sankar Bhadhury (Cultural Secretary).

Standing : (From Left)—Supradip Sen, Manotosh Dhar, Ashit Bose, Rakhaldas Bhattacharyya, Pranab Lahiri, Asoke Bhattacharyya, Santosh Banerjee, Manindra Nath Chakraborty, Tapan Das Gupta, Ajoy Ghosh (Debating Secretary), Ashis Das Gupta, Gopal Goswami.

Asutosh College Foot-Ball Team—1948.

INTER COLLEGIATE LEAGUE CHAMPION & ELLIOT SHIELD WINNER.

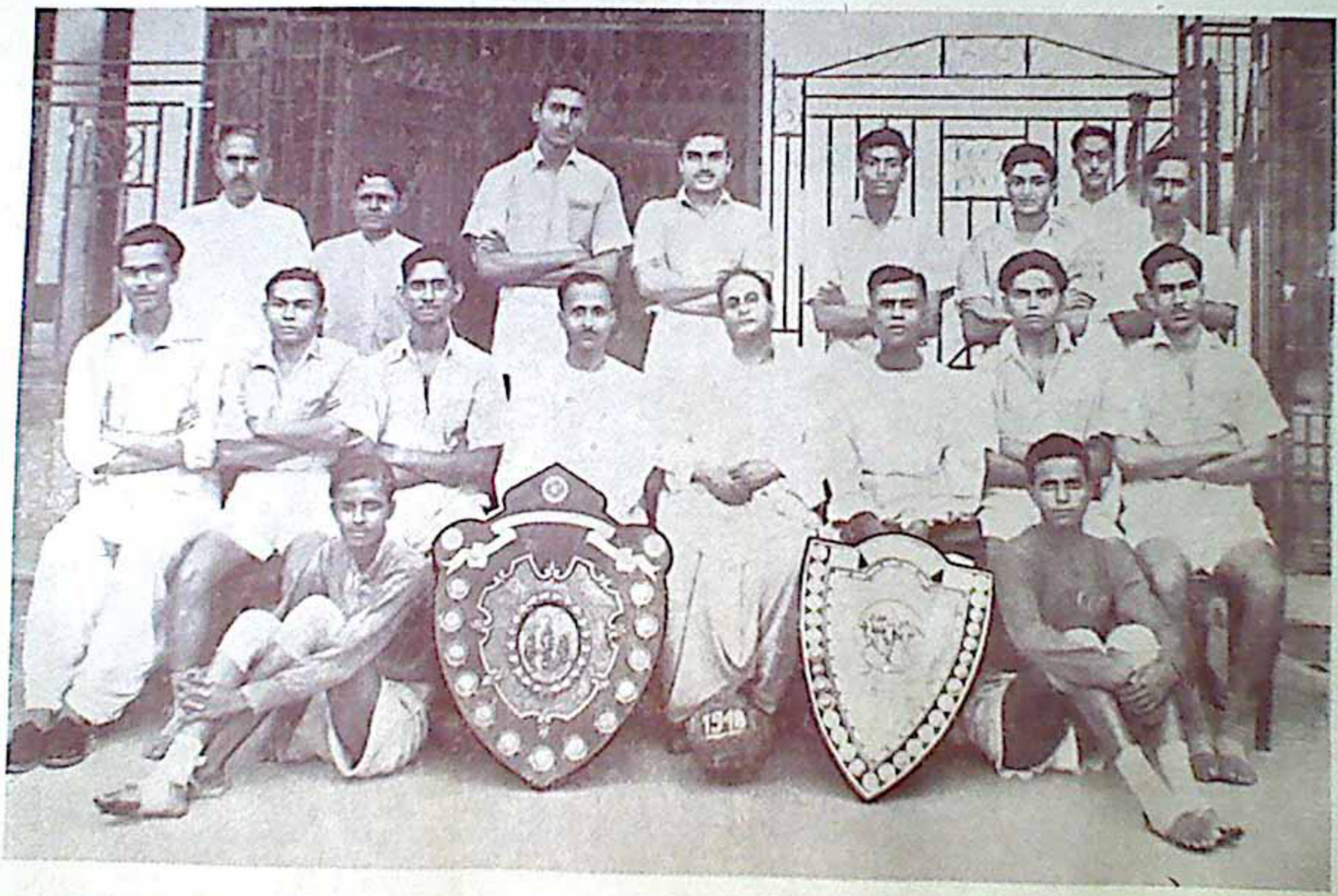

Standing : (From Left)—J. Singh (Darwan), Swapan (Mali), K. Das Gupta, G. Chatterjee, B. Roy, S. Banerjee, A. Roy Choudhury, Basanta (Bearer).

On Chair : (From Left)—A. Singha, (Games Secretary), D. Ganguly, P. Guha (Captain), Prof. N. Bhattacharyya (In-charge of Games), Principal S. Mukherjee, Prof. P. Roy (In-charge of Games), S. Sirkar, B. Chatterjee.

On Ground ; (From Left)—D. Sen Gupta, M. Sirker.

ভাষা জ্ঞান

অধ্যাপক শ্রীবিজনবিহারী ভট্টাচার্য

উচ্চ শিক্ষার মাধ্যম হিসাবে বাঙ্গালা দেশ বাঙ্গালা ভাষাকেই গ্রহণ করিবে, না ইংরাজীকে, তাহা লইয়া বাদবিতণ্ডা শুরু হইয়াছে। ইংরাজী যদি বাতিল হয় তো বাঙ্গালার বদলে রাষ্ট্রভাষাও ইংরাজীর স্থান গ্রহণ করিতে পারে, তা সে সংস্কৃতই হউক অথবা হিন্দী হিন্দুস্থানীই হউক। উচ্চতর শিক্ষার বাহনরূপে ইংরাজীকে তাড়াইলেই যে বাঙ্গালার স্থান পাকা হইবে এমন আশা করার কোনো কারণ দেখিতেছি না। কোন্ ভাষা ভাল কোন্ ভাষা মন্দ, কাহার যোগ্যতা অধিক কাহার যোগ্যতা অল্প সে সব আলোচনা রাষ্ট্র-নীতির অন্তর্ভুক্ত হইয়া পড়িয়াছে। এ অবস্থায় আমাদের মত লোকের পক্ষে মৌন থাকাই ভালো।

উচ্চতর শিক্ষার বাহন এবং রাষ্ট্রভাষার আলোচনা না করিয়া আজ শুধু এই কথাটাই বিশেষ করিয়া বলিতে চাই যে, আমাদের একবার নীচের দিকে তাকাইতে হইবে। তিনতলা ইমারত হাঁকিয়া যাইতেছি, কিন্তু পায়ের তলার মাটি যে আলগা। তাই ছাদ গাঁথিবার আগেই দেওয়াল ধ্বসিয়া পড়ে। দেশের ছেলেমেয়ের ভাষা জ্ঞানের ভিত যে কত কাঁচা সে সম্বন্ধে জনসাধারণের ধারণা নাই বলিলেই হয়। তাঁহারা ছেলেমেয়েকে ইস্কুলে পাঠাইলেন, ভাবিলেন তাঁহাদের কর্তব্য শেষ হইল। তাহারা কোনো রকমে পরীক্ষায় পাস করিলেই মা-বাপ চরিতার্থ হইলেন; আর যদি নিজ গুণে পাস করিতে না পারে তো তদ্বির, সুপারিশ, কান্নাকাটি, হাঁটাহাঁটি। পুত্রকন্যাকে পাস করানো অনেকে পিতার অন্যতম কর্তব্য বলিয়া মনে করেন। কিন্তু পরীক্ষার পূর্বে তাহার অন্নবস্ত্র, স্কুলের মাহিনা এবং সিনেমার টিকিটের সংস্থান করা ভিন্ন পিতার কি আর কোনো দায়িত্ব নাই?

পাঠ্যতালিকা এবং পাঠ্যবিধি লইয়া শিক্ষাবিদ্‌গণ দীর্ঘকাল ধরিয়া চিন্তা করিতেছেন বলিয়া শুনি। মাঝে মাঝে সরকারী শিক্ষা বিভাগ হইতে পাঠ্যতালিকা ও পাঠ্যবিধি সংশোধিত ও পরিবর্তিত হইয়া থাকে, তাহাও আমাদের দৃষ্টিগোচর হয়। কিন্তু ফল কি হইতেছে?

বাঙ্গালা দেশে প্রবেশিকা পরীক্ষার জন্য বাঙ্গালা ভাষাই মাধ্যম বলিয়া স্বীকৃত হইয়াছে। স্বাধীনতালাভের অন্ততঃ দশ বৎসর পূর্ব হইতে তদনুযায়ী শিক্ষাদানের ব্যবস্থা প্রবর্তিত হইয়াছে। বাঙ্গালার মাধ্যমে ইংরাজী ব্যতীত সকল বিষয়ের পরীক্ষা প্রথম গৃহীত হয় ১৯৪০ সালে। এবং বাঙ্গালায় ইংরাজী ব্যতীত অন্যান্য সকল বিষয়ে শিক্ষাদান আরম্ভ হয় ১৯৩৬ সাল হইতে। আমরা ধরিয়া লইয়াছিলাম, মাতৃভাষায় অধ্যয়ন করিবার সুযোগ পাইলে ছাত্রছাত্রীরা সহজেই পঠিতব্য বিষয় আয়ত্ত করিতে সমর্থ হইবে। শুধু গণিত বিজ্ঞান ভূগোল ইতিহাস শিখিবার সুবিধা হইবে বলিয়া নয়, মাতৃভাষার উপর অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্যও মাতৃভাষার চর্চা প্রয়োজন। মাতৃভাষায় অধিকার জন্মিয়া গেলে বিদেশী ইংরাজী ভাষা আয়ত্ত করাও অপেক্ষাকৃত সুকর হইবে। সেই কারণে প্রবেশিকা পরীক্ষায় বাঙ্গালা ভাষার প্রতিও দৃষ্টি দেওয়া হয়। পাঠ্যতালিকা বাঙ্গালা সাহিত্যের সঙ্গে সঙ্গে বাঙ্গালা ব্যাকরণেও বেশ ভারী হইয়া উঠে। প্রশ্নপত্রও দ্বিগুণিত হইয়া যায়।

এদিকে মাতৃভাষার জ্ঞান বাড়াইবার জন্য আয়োজনের বহর যেই বৃদ্ধি পাইল, অমনি অন্যদিকে ইংরাজীর জ্ঞান

কমিয়া যাইবার আশঙ্কায় এক সম্প্রদায় আতঙ্কিত হইয়া উঠিলেন। তাঁহারা বলিলেন, ইংরাজী ভাষা শিক্ষা ও পরীক্ষার মাধ্যম থাকাতে ছাত্রছাত্রীরা ইংরাজী শিক্ষার একটা অতিরিক্ত সুযোগ পাইয়া আসিতেছিল। ইংরাজী সাহিত্য বা ব্যাকরণ মাত্র পড়িয়া সেই অতিরিক্ত লাভটা হয় না। কাজেই ইংরাজী ভাষায় বাঙ্গালী বিদ্যার্থীর অধিকার কমিয়া যাইবে। এই সমস্যার সমাধান কোথায়? শেষ পর্যন্ত রফা হইল, ইংরাজী ভাষার পাঠ্য বাড়াইয়া দেওয়া হউক। এখন ইংরাজী ভাষার ২৫০ নম্বরের আড়াইটি প্রশ্নপত্র রচিত হয়। ১৯৩৬ হইতে ১৯৪৮ সাল পর্যন্ত এই পাঠ্যবিধি অনুসারে পঠনপাঠন চলিয়া আসিতেছে। আমাদের পুত্রকন্যারা বাঙ্গালা ভাষায় যথেষ্ট এবং ইংরাজী ভাষায় কাজ চালাইবার মত জ্ঞান পাইতেছে ইহাই আশা করিবার কথা। এখন একবার পরীক্ষা করিয়া দেখা যাক্, কার্যতঃ কতদূর কি হইয়াছে।

অনুমান দিয়া পরীক্ষা হয় না, হইলেও তাহা নির্ভরযোগ্য নয়। কাজেই অনুমানের উপর নির্ভর না করিয়া কয়েকটি প্রত্যক্ষ প্রমাণ দিতেছি। প্রমাণগুলি উদ্ধৃত হইয়াছে একদল পরীক্ষার্থীর উত্তরপত্র হইতে। পরীক্ষার্থিগণ সকলেই প্রবেশিকায় উত্তীর্ণ; ১৯৪০ হইতে ১৯৪৮-এর মধ্যেই তাঁহারা প্রবেশিকা পরীক্ষায় পাস করিয়াছেন। শুধু তাহাই নহে, ইঁহাদের প্রত্যেকেই ইণ্টারমিডিয়েট প্রথম বার্ষিক শ্রেণীর পাঠও অর্ধেকের উপর শেষ করিয়াছেন। অনেকেই জানেন, তথাপি আবার বলিয়া রাখি, ইণ্টারমিডিয়েটে বাঙ্গালা ও ইংরাজী উভয় ভাষাই আবশ্যক বিষয়।

কোনো প্রথম শ্রেণীর কলেজে প্রথম বার্ষিক শ্রেণীর পিরিওডিক্যাল পরীক্ষার প্রশ্নপত্রে বাঙ্গালায় অনুবাদ করিবার জন্য একটি ইংরাজী অনুচ্ছেদ তুলিয়া দেওয়া হয়। সেই অনুচ্ছেদটি এবং তৎসহিত বাঙ্গালা অনুবাদের কয়েকটি নিদর্শন পরীক্ষার্থীদের উত্তরপত্র হইতে উদ্ধৃত করিয়া দিলাম। উত্তরপত্রের অন্যান্য উত্তরও যথেষ্ট চিত্তাকর্ষক, কিন্তু বাঙ্গালা ও ইংরাজী মাতৃ এবং বিমাতৃ উভয় ভাষার জ্ঞানের নমুনা একত্র প্রদর্শনের পক্ষে অনুবাদ অংশটিই সমধিক উপযুক্ত মনে করি।

অনুবাদের জন্য প্রদত্ত ইংরাজী অনুচ্ছেদ

৯। বাঙ্‌লায় অনুবাদ কর:—

The kind reception accorded to the first edition by teachers and students has enabled me to bring out this revised and enlarged edition. Illustrations have been taken mainly from the texts prescribed for the Intermediate Examination of Calcutta University and Standard English authors so that students may not have any difficulty in understanding them. I gratefully acknowledge the encouragement I have received from many teachers of the subject who have been kind enough to recommend the book to the notice of their students in various colleges of Bengal and of some other provinces.

অনুবাদের নিদর্শন

১

প্রথমে শিক্ষক ও ছাত্রদের দ্বারা শিক্ষার প্রচলন উদ্বোধন হয়। এইরূপে আমাকে পরিবর্তিত ও বৃহৎ অধ্যায়ে উপনীত হইতে সাহায্য করিয়াছে। যাহাতে ছাত্রদের বুঝিতে কষ্ট না হয় তৎজন্য কলিকাতার বিশ্ববিদ্যালয়ের মাধ্যমিক পরিক্ষার জন্য সরল ইংরাজি প্রচলন করিলেন।

২

প্রথম সংস্করণের প্রতি শিক্ষক ও ছাত্রগণের শ্রদ্ধা জ্ঞাপনে আমি সক্ষম হয়েছি এই পুনঃ ও বর্দ্ধিত সংস্করণ বাহির করিতে। উদাহরণগুলি প্রধানতঃ কলি বিশ্ববিদ্যালয়ের একাদশ পরীক্ষার পাঠ্যপুস্তক হইতে লওয়া হইয়াছে এবং ইংরাজি লেখকদের বাদে করা হয়েছে যাহাতে ছাত্রদের বুঝিতে কোন অসুবিধা না হয়।

৩

ছাত্র ও শিক্ষকদের মধ্যে এই দয়ালু সমাধান হইয়া গেল এই উদাহরণে জানা যায় স্থায়ী ইংরাজী গ্রন্থকারদের ছাপানো বই কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আই এ এবং আই এ সি পরীক্ষার জন্ত। ইহাতে ছাত্রদের বুঝিবার পক্ষে কোন অসুবিধা হয় নাই।

৪

প্রথম সংস্কার শিক্ষক এবং ছাত্র আমাকে মুদ্রিত এবং করিতে বাইর করিতে অনুনয় করে। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় মাধ্যমিক পরীক্ষায় তুলিবার জন্ত এবং ইংরাজী আখরদিগের বুঝিবার পক্ষে কোন সুবিধা হয় নাই। আমি বড়ই কৃতজ্ঞ যে বহু ছাত্র এই রেকমেণ্ড—।

৫

ছাত্র এবং শিক্ষকদের সুহৃদয় সম্বর্ধনা আমাকে কৃতকার্য করিয়াছে এই পরিবর্তিত ও পরিবর্দ্ধিত সংস্করণ ছাপাইতে। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক প্রবর্তিত ইণ্টারমিডিয়েট ইংরেজী পুস্তক হইতে প্রধানতঃ ইহার টিকাটিপ্পনীগুলি গৃহীত হইয়াছে, ইংরেজী মধ্যম রকমের যাহাতে কোন রূপ অসুবিধার মধ্যে পড়িতে না হয়।

৬

প্রথম সম্বন্ধে শিক্ষক ও ছাত্র আমাকে আরও পূর্ব্বাবৃত্তি ও বৃহৎভাবে সংরক্ষিত করিয়া দূশন করিতেছে। আমরা কলিকাতা ইউনিভারসিটি ইণ্টারমিডিয়েট পরীক্ষার্থীগণের নিকট হইতে জানিতে পারি যে যে সমস্ত ইংরাজী বইয়ের গ্রন্থকারের লেখা তাহা ছাত্রদের বুঝা খুব কঠিন হয় না। আমি খুব আনন্দের সহিত তাহাদের মত স্বীকার করিলাম, যে আমি অনেক শিক্ষকের নিকট হইতে জানিতে পারিয়াছি, যে সমস্ত বই ছাত্রদের জন্ত বাংলা দেশের কলেজে এবং অন্যান্য প্রদেশের কলেজে দেওয়া হয় তাহা খুব কঠিন নই। ইহাই আমার অভিমত।

৭

শিক্ষক ও ছাত্রগণের নিকট আমার প্রথম সংস্করণের জন্ত আদর অভিনন্দন জ্ঞাপন করিতেছি। তাহারা যেন আমার এই সংস্করণ বর্দ্ধিত করিয়া বাড়াইবার জন্ত বাধ্য করেন। বর্দ্ধিত সংখ্যা যেন আধুনিক ইংরাজী লেখক ও কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনস্থ আই এ পরীক্ষার জন্য নির্দ্দিষ্ট পাঠ্য পুস্তক হইতে লওয়া হয়। যাহাতে ছাত্রদের বুঝিবার কোন অসুবিধা না হয়।

৮

প্রথম সংস্করণে শিক্ষকগণ কর্তৃক মনোনীত বিষয় নির্বাচন এবং ছাত্রগণ কর্তৃক সাদর গ্রহণের ফলেই আমাকে এই পরবর্ত্তী এবং পরিবর্দ্ধিত সংস্করণ প্রকাশে সামর্থ্য প্রদান করিয়াছে।

৯

প্রথম সম্মেলনে শিক্ষক এবং ছাত্রগণ আমাকে সমর্থন করিয়াছিল। এই নূতন পরিবর্ত্তনে প্রেরণা দান করিয়াছে ইহা বুঝিতে ছাত্রগণের যাহাতে কষ্ট না হয়, তাহার জন্ত মূল্য গ্রন্থ হইতে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের মাধ্যমিক পরীক্ষাসমূহের জন্ত উদাহরণ গ্রহণ করা হইয়াছে। যাহার যে বিশয়ে শিক্ষক তাহার আবার বই তাহাদের স্কুল ও কলেজের ছাত্রদের জন্ত অনুমদিত করিয়া আমাকে উৎসাহিত করিয়াছেন তাহার জন্ত আমি তাহাদের সিকট কৃতজ্ঞতা স্বীকার করিতেছি।

১০

প্রথম বোধিনীখানা শিক্ষকগণ কর্তৃক সমাদৃত হওয়ায় ছাত্রগণ আমাকে এই বোধিনীখানা পুনঃপ্রকাশ করিতে বলিয়াছে। ভাল ইংরাজি পুস্তক হইতে এবং কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের মাধ্যমিক পরীক্ষার পুস্তক হইতেও অনেক উদাহরণ গ্রহন করা হইয়াছে। এবং এ পুস্তক আয়ত্ত করিতে ছাত্রদের কোন বেগ পাইতে হইবে না। শিক্ষকদের নিকট হইতে যে সংবাদ পাইয়াছি তাহাতে আমি কৃতজ্ঞপুর্ণভাবে বাধিত হইয়াছি। তাহারা এই বইখানা কোন কোন প্রদেশে এবং বাংলার প্রত্যেক কলেজে প্রকাশ করিতে ছাত্রদের বিজ্ঞাপন দিয়াছে।

১১

ছাত্র ও শিক্ষকগণ আমাকে প্রথম অধ্যায় পরিদর্শন করিতে খুব অনুরোধ করেন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের মাধ্যমিক ইংরাজি সাহিত্য পরিদর্শনের পর ছাত্রদিগকে বুঝিতে বিশেষ কষ্ট হয় না ইহা আশা করা যায়। আমি কৃতজ্ঞতা এবং আনন্দের সহিত শিক্ষকদের নিকট হইতে জানিতে পারিয়াছি যে সমস্ত পুস্তক বাংলা ও অন্যান্য কলেজের জন্য প্রকাশিত করা হয় তাহা নাকি ছাত্রগণ ভালভাবে বুঝিতে পারে।

১২

প্রথম বর্ষে শিক্ষক ও ছাত্রদের মধুর আলাপে আমাদের পুনঃশক্তি বৃদ্ধি করিতে আরম্ভ করিল। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের মাধ্যমিক পরীক্ষার ইংরাজী সাহিত্য হইতে অনেক উদাহরণ লওয়া হইয়াছে এবং ইংরাজীর গ্রন্থকাররা ছাত্রদিগকে ভাল করিয়া বুঝাইতে পারেন নাই। বাংলায় বিখ্যাত কলেজে এবং অন্যান্য প্রদেশের কলেজের শিক্ষকগণের নিকট হইতে আমি ইংরাজী বিষয়ে ছাত্রদের কিরূপ দখল আছে তাহা আমি সর্ব সর্বতোভাবে অবগত হইয়াছি।

১৩

শিক্ষকগণ ও ছাত্রগণ প্রথম শতক পুনরাবৃত্তি ও বড় করিয়া আমাদের জন্য আনেন।.....

১৪

প্রথম সংস্করণের পর আমি ছাত্র ও শিক্ষকসমাজের নিকট হইতে যে অভ্যর্থনা ও অনুরোধ পাইলাম তাহাতে আমি আরও সুস্থ ও পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে লিখিত দ্বিতীয় সংস্করণ বাহির করিতে বাধ্য হইয়াছি।

১৫

আমাকে শিক্ষকবৃন্দ এবং ছাত্রবৃন্দ একটি ভাল সম্বর্দ্ধনা দিয়াছে কারণ প্রথম অনুকরণ আবার ভাল করিয়া বড় করিয়া করিবার জন্য।

১৬

শিক্ষকসমাজই প্রথম দয়ালু অভ্যর্থনার বার্তা করিয়াছিলেন। ছাত্রসমাজ তাহা বহন করিতে সক্ষম হইয়াছিল।.....আমি বহু শিক্ষকের নিকট হইতে আনন্দে উৎসাহের সহিত এই বিষয় বুঝিয়া লইয়াছিলাম।

প্রতিলিপি করিতে গিয়া ভুলক্রমে অনেক ভুল সংশোধিত হইয়া থাকিতে পারে। মুদ্রণের সময়েও কিছু কিছু অশুদ্ধির বিশুদ্ধিসংঘটন সম্ভব।

এই তো অবস্থা! এখন কর্তব্য কি? শুধু সিলেবাস পরিবর্তন অথবা সেকেণ্ডারি বোর্ড সংগঠন করিলেই কি কার্যোদ্ধার হইবে? হয়তো হউক! *

* রবিবাসরীয় আনন্দবাজার পত্রিকায় (March 20, 1949) প্রকাশিত

জীবনায়ন

শ্রীঅমিত রায়
তৃতীয় বর্ষ কলা

অমসৃণ জীবনের পথে পথে অলিতে গলিতে
ছড়ানো সোনার রঙ্ অবরুদ্ধ প্রাসাদের ভিতে
নাম-হারা অজানারা খুঁজে মরি ব্যর্থ অন্বেষণে
না-পাওয়া সাধনা যত ভিড় করে' মাথা কোটে মনে।

কৈশোরের কিশলয়ে শ্যাম শষ্প ধীরে তোলে মাথা
নবীন জীবনে ভাবি, নব মন্ত্র আমিই উদ্গাতা
যৌবনের লাল রংএ নব সূর্য্য খুলে দেয় দ্বার
এ' ধরারে মনে করি, সুধাপাত্র পূর্ণ কামনার॥

আমার প্রাণের ক্ষেতে আফলা বীজের অভ্যুদয়
ভবিষ্যৎ মহীরুহ আমার চোখেতে স্বপ্ন হয়:
ধীরে ধীরে কাটে দিন, স্বপ্ন সে যে চকিতে মিলায়
অবরুদ্ধ কারামাঝে তবু মন মরে প্রত্যাশায়।

মর্ম-ভাঙ্গা রক্ত-রাঙা কাহিনীর জলন্ত অক্ষরে
যৌবন কালের গান ইতিহাস রাখে স্তরে স্তরে
একদিন তবু দেখি তার যত জীর্ণ ঝরা পাতা
বিবর্ণ বিমর্ষ মুখে আজি তার নোয়ায়েছে মাথা॥

"অক্ষয় অনন্ত প্রাণ"—এ বাণীরে করি না বিশ্বাস,
সর্পিল কুটীল পথে দানবীরা ফেলে যায় শ্বাস
সে শ্বাসের বাষ্প দিয়ে ভারাক্রান্ত আমার পঞ্জর
অগ্নিক্ষরা মন্ত্র ভুলে, আজ আমি নিস্তব্ধ নিথর॥

বাংলা কাব্যসাহিত্যে নবযুগের লক্ষণ

শ্রীইন্দিরা দাশগুপ্তা—প্রথম বর্ষ সাহিত্য

উনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় দশকে বাংলা সাহিত্য জগতে এক নবযুগের সূচনা হয় এই যুগের গোড়াপত্তন বহু পূর্ব্ব হইতে হইলেও মধুসূদনের হাতে ইহা স্পষ্টরূপে পায়। প্রাক্-মধুসূদন যুগে যে সমস্ত কাব্য রচিত হইত সে সমস্তই ছিল গীতিপ্রধান। রাধাকৃষ্ণের কল্পিতপ্রেম বা দেবদেবীর পূজা প্রচার কাহিনীই প্রাচীন বাংলা-কাব্যের একমাত্র উপজীব্য ছিল। ইহা ছাড়া অনুবাদ সাহিত্য নামে একপ্রকার সাহিত্য প্রচলিত ছিল। রামায়ণ, মহাভারত, ভাগবত প্রভৃতির বাংলা অনুবাদ এই সাহিত্যের অন্তর্ভুক্ত। কিন্তু এই সমস্ত অনুবাদ সাহিত্যেও দেবতাকে নায়ক করিয়া রচিত হইত। দেব-মহিমা প্রচারই ইহার একমাত্র উদ্দেশ্য। মানুষ সেখানে অতিশয় অপ্রধান ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছে। এইসব প্রাচীন বাংলা সাহিত্যের দোষ এই যে ইহাতে মানুষ এবং মানুষের জগৎ এবং জীবনকে নিরতিশয় উপেক্ষা করা হইয়াছে। সাহিত্যের মধ্য দিয়া মানুষ কখনই নিজের জীবনকে দেখিতে পারে নাই। স্বপ্নকল্পিত কোন সুদূর বৈকুণ্ঠলোকের কাহিনী সাহিত্যের মধ্যে অনুবর্ত্তন হইয়াছে। ইহাতে বাস্তবজীবনের কোন সমস্যা সমাধানে প্রচেষ্টা নাই। কবি এক অতিন্দ্রীয় ভাবলোকে প্রস্থান করিয়া সেখান হইতে আধ্যাত্মিক সাধনার কতকগুলি তত্ত্ব প্রচার করিতেন মাত্র। ইহাতে কবির নিজের ব্যক্তি অনুভূতি, কবি কীর্তির সেই অপূর্ব্ব দান প্রেরণার কোন স্পর্শ পাওয়া যাইতনা। কবিকে একটি কৃত্রিম গণ্ডীর মধ্যে বিচরণ করিতে হইত। তাহার নিজস্ব চিন্তা কিংবা ভাবকল্পনার বিশেষ স্থান ইহাতে ছিল না। কবির ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য বিশেষভাবে উপেক্ষিত হইয়াছে। কবির দৃষ্টি যে উর্দ্ধে স্বপ্নলোকে বিচরণ করিতে পারেনা, তাহা আমরা বলিনা। অথবা কবি যে কল্পনার আকাশগঙ্গায় স্নান করিতে পারেন না তাহাও অস্বীকার করিতে পারিনা; কিন্তু তাহা প্রসঙ্গত। কবির দৃষ্টি প্রধানতঃ এই মর্ত্তলোকে বিচরণ করিয়া থাকে এবং মানুষের জীবনের প্রত্যক্ষরূপ তাহার কাছেই বিশেষ করিয়া ধরা পড়ে। তাই কবির সৃষ্টির সার্থকতা ঘটে মানুষের জীবনে রস-রহস্য-উদ্ঘাটন দ্বারা। প্রাচীন-কালের কাব্য সাহিত্যে ইহার একান্ত অভাব আমরা লক্ষ্য করিয়াছি।

মধ্যযুগের কাব্যসাহিত্যে আমরা এইসব দেবদেবীর বন্দনা কিংবা তাহাদের মহিমা প্রচার অথবা রাধাকৃষ্ণের প্রেমগীতিরই পুনরাবৃত্তি লক্ষ্য করিয়া থাকি। বরং প্রাচীনকালে যে শ্রদ্ধা ও নিষ্ঠা লইয়া সাহিত্য রচিত হইত মধ্যযুগে আসিয়া তাহারও অভাব সূচিত হয়। দেবতাকে টানিয়া মানুষের পর্য্যায়ে নামান হইয়াছে। কিন্তু এর প্রধান ত্রুটি ছিল এই যে দেব-চরিত্রের যে মহিমময় অংশ মানুষকে মুগ্ধ ও ধন্য করিবে তাহা প্রায়ই অঙ্কিত হইত না। এই জন্যে সে যুগের কাব্যপাঠে লোকের মনে দেবতাদের প্রতি শ্রদ্ধাও প্রকাশ পাইতনা। দেবচরিত্রে মানবীয় ভাবই অধিকতর পরিস্ফুট হইত। মনসার নিজ পূজা প্রচার করিবার প্রাণান্ত চেষ্টা; শিব ও অন্নপূর্ণার সাংসারিক ঝগড়া, নারদ-মুনির আচার ব্যবহার—আমাদের মনে শ্রদ্ধার চেয়ে হাস্যের উদ্রেকই বেশী করে। কিন্তু তাহা হইলেও এই একঘেয়ে গীতিকাব্যকে উত্তীর্ণ করিয়া কোন কাব্য কেহ রচনা করিতে পারে নাই। কিন্তু রামপ্রসাদের সময়

হইতে গীতিকাব্যের ধারা ধীরে ধীরে দিক পরিবর্তন করিতে লাগিল। তিনি রাধাকৃষ্ণের প্রণয় কাহিনীকে অতিক্রম করিয়া গীতিকাব্যের শ্যামা সঙ্গীত রচনা করিতে লাগিলেন। এই সমস্ত শ্যামা বিষয়ক সঙ্গীতে বিশেষভাবে আধ্যাত্মিকতার পরিচয় পাওয়া যায়।

ভারতচন্দ্র রামপ্রসাদেরই সমসাময়িক। ভারতচন্দ্রের মঙ্গলকাব্যে দেব-দেবীর বন্দনা, দক্ষযজ্ঞ, শিবের বিবাহ, ব্যাসের কাশী নির্মাণ ইত্যাদির বর্ণনা আছে। রামপ্রসাদ ভারতচন্দ্র প্রমুখ কবিওয়ালাদিগের লেখা যথেষ্ট রসোত্তীর্ণ হইলেও পুরাণো গীতিকাব্যের একঘেয়েমি ভাব ইহাতে বহুল পরিমাণে বিদ্যমান ছিল। আর অধিকাংশই সঙ্গীতময় ভাবধর্মী। আবার মুকুন্দরামের কবিকংকণ চণ্ডীতে অলৌকিক ঘটনা সমাবেশ হইয়াছে। কৃত্তিবাসের রামায়ণ ও কাশীরাম দাসের মহাভারত বাঙালীর জাতীয় জীবনে ধর্মের প্লাবন আনিয়া দেয়। কবিগণ ইহার অনুবাদ করিতে লাগিলেন।

এই সময়ে মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যদেব মানব-প্রেমের বাণী প্রচার করেন। শ্রীচৈতন্যের বাণী যাহা এককালে মানুষের হৃদয় হইতে বাহির হইয়াছিল তাহা মানুষের হৃদয়কে স্পর্শ করিল। মানুষের দৃষ্টি ক্রমে ক্রমে স্বর্গ ছাড়িয়া মাটির পৃথিবীর দিকে পড়িল। লোকে দেখিতে পাইল স্বর্গের ন্যায় তাহাদের চতুর্দিকের মর্তেও জাতিতে জাতিতে, সভ্যতায় সভ্যতায় সংগ্রাম ও সন্ধি চলিয়াছে। নূতন জাতি, নূতন দেশ, নূতন সভ্যতা গড়িয়া উঠিতেছে। শৌর্য্যে, বীর্য্যে, সৌন্দর্য্যে, প্রেমেও অনেক সার্থক দেবোপম মানব চরিত্র রহিয়াছে। তাহারা পূর্বে জানিত না যে দেবদেবী ছাড়া আর কেহ কাব্যের নায়ক বা নায়িকা হইতে পারে। চৈতন্যের মানবপ্রেমে উদ্বোধিত হইয়া কাব্যকাররা নূতনভাবে কাব্য রচনায় প্রবৃত্ত হন। প্রকৃতির সঙ্গে মানুষের অচ্ছেদ্য যোগাযোগ রহিয়াছে। জগৎ এবং জীবনের এই নিবিড় যোগাযোগ কাব্যে রূপ পাইতে লাগিল। এই যুগে জগৎ এবং জীবন সম্পর্কিত আলোচনায় কবি মানুষের জীবন ও মানুষের চরিত্রকেই একান্তভাবে আশ্রয় করিতে সাহসী হয় নাই। বরং মানুষের মহিমাকেই নানাভাবে ক্ষুণ্ণ করা হইয়াছে। বাঙলা সাহিত্যে এতবড় পুরুষকার চরিত্র চাঁদসদাগর শেষ পর্য্যন্ত কবির হাতে পড়িয়া চরম লাঞ্ছনা বরণ করিয়া মনসা দেবীর পূজা দ্বারা নিজের মনুষ্যত্বের অপমান স্বীকার করিয়া লইলেন। তথাপি এইযুগের স্বর্গের দেবতা মাটির বুকে লীলাছলে প্রেমের মহিমা নূতনভাবে প্রচার করিলেন। দেবতার ঐশ্বর্য্যমূর্ত্তি ক্রমে মানুষ শ্রীচৈতন্যদেবের মধুর রস মূর্ত্তিতে মহিমময় হইয়া উঠিল। স্বর্গের প্রেম মর্ত্তের কুটিরে জীবন্ত হইয়া উঠিল।

প্রাচীনযুগ ও আধুনিক যুগের সন্ধিকালে কবিবর ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত বাংলা কাব্য-সাহিত্যের মোড় ফিরাইয়া দিলেন। ঈশ্বর গুপ্তের কাব্যে ভারতচন্দ্রের আভাস পাওয়া যায়। আবার পাশ্চাত্য প্রভাব আমাদের সাহিত্যে যে যুগান্তর আনিয়াছে তাহার পূর্বাভাসও ঈশ্বর গুপ্তের কবিতায় পাওয়া যায়। দেশপ্রীতিমূলক কবিতা ছিল প্রাচীন সাহিত্যে দুর্লভ। ঈশ্বরগুপ্তের কবিতার অন্যতম বিশিষ্টতা স্বদেশ প্রেম। তথাপি ঈশ্বরগুপ্ত অন্যদিক দিয়া কাব্যে আধুনিকতাকে বরণ করিয়া লইতে পারিলেন না। কাব্যের মধ্যে মনুষ্যত্ব-বোধ ফুটাইয়া তোলা কিংবা কবির ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যকে প্রতিষ্ঠা করিবার প্রেরণা তিনি লাভ করেন নাই। সম্ভবতঃ তাঁহার কবি মানস এ বিষয়ে আত্মসচেতন ছিল না। এজন্য আমরা ঈশ্বরচন্দ্রের কাব্যের মধ্যে নূতনত্ব আবিষ্কার করিলেও তাঁহাকে নবযুগের কবি বলিয়া স্বীকার করিয়া নিতে পারি না। প্রাচীনতার উপরই নূতন চুণকাম করা কিংবা নূতন রং দেওয়া ছাড়া তিনি আর কিছুই করিতে পারেন নাই।

জাতীয় জীবনের এই যুগ সন্ধিক্ষণে মধুসূদন বাংলা সাহিত্যের আসরে অবতীর্ণ হইলেন। ইংরাজের প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের মিলন ধারণা, ইউরোপীয় সাহিত্য ও চিন্তাধারার যে জোয়ার এদেশে আসিল মধুসূদন তাহাতে ভাসিয়া গেলেন। প্রাণশূন্য সাহিত্যে তিনি

প্রাণের সঞ্চার করিলেন। বাংলা কাব্য সাহিত্যে যুগান্তর উপস্থিত হইল। নিজ প্রতিভা ও আত্মপ্রত্যয় দ্বারা মধুসূদন পাশ্চাত্য সাহিত্য হইতে উপকরণ সংগ্রহ করিয়া কাব্য রচনা করিয়া মাতৃভাষাকে সমৃদ্ধ করিলেন। জগৎ এবং জীবনের স্পর্শে তাহার রচনা আলোকিত হইল। মনুষ্যত্ববোধ জাগরিত হইয়াছিল বলিয়া তিনি কাব্যে মানুষকে আশ্রয় করিয়া মনুষ্যত্বের মহিমা গাহিয়া তাঁহার কবিকীর্তি অক্ষয় করিয়া তুলিলেন।

পাশ্চাত্যের জীবন ঘটনাবহুল, বৈচিত্রময়, ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যের মন্ত্রে উজ্জীবিত। ইউরোপীয় সাহিত্যে আধ্যাত্মিক পরমার্থিক মহিমাকে কোনদিনই বড় করিয়া তোলা হয় নাই। ইউরোপীয় জীবন দর্শন ভারতীয় আধ্যাত্মিকতা হইতে স্বতন্ত্র; এবং সেখানে জীবনকে এবং জীবন সম্পর্কিত নানাবিধ সমস্যাকে স্বীকার করিয়া লওয়া হইয়াছে। মানুষের ভিতর ও বাহিরে যতখানি সমস্যা আছে তাহা আপন পুরুষকারের মধ্য দিয়া সমাধান করিতে হইবে। এই পুরুষকার নিশ্চেষ্টতা কিংবা কর্মহীনতার ভিতর দিয়া প্রকাশ হয় না। বরং দেহ ও প্রাণের নানাবিধ উদ্যম ও কর্মসাধনার মধ্য দিয়া ইহা সার্থকতা লাভ করে। প্রতীচ্যে কাব্য এই পুরুষকারকে আশ্রয় করিয়া মনুষ্যত্বের জয়গান করিয়াছে। প্রায় প্রত্যেকটি কাব্যই মানুষের এই দেহ ও প্রাণের অধিকারকে স্বীকার করিয়া লইয়াছে।

ইউরোপীয় জীবনদর্শন দ্বারা অনুপ্রাণিত হইয়া মধুসূদন কাব্যের রচনায় প্রবৃত্ত হইলেন। তিনি অসাধারণ প্রতিভা বলে ইউরোপীয় কাব্যের এই মনুষ্যত্ব মন্ত্র আয়ত্ত করিয়া লইলেন। সুদক্ষ স্রষ্টার ন্যায় মধুসূদন রামায়ণের প্রচলিত আদর্শ পরিত্যাগ করিয়া "মেঘনাদ বধ" মহাকাব্য সৃষ্টি করিলেন। সমগ্র "মেঘনাদ বধ" কাব্যের মধ্যে মানুষ বড় হইয়া উঠিয়াছে। দেবতা সেখানে ক্ষুদ্রাশয়; নীচ। আমাদের সকল শ্রদ্ধা, ক্ষমা, ভক্তি, মানুষ, রাবণ ও ইন্দ্রজিতের পদপ্রান্তে নিবেদন করি। তাই "মেঘনাদ বধ" কাব্যের নায়ক দেবতা, রাম ও লক্ষ্মণ নহেন।—মানুষ রাবণ ও মানুষ ইন্দ্রজিতই সেই কাব্যের নায়ক। অথচ পাশ্চাত্য সাহিত্য হইতে নানাবিধ উপকরণ সংগ্রহ করিলেও তিনি প্রত্যেকটি চরিত্রকে আমাদের দেশীয় ভাবধারায় এমন ভাবে চিত্রিত করিয়াছেন যাহা অপূর্ব্ব সুষমায় মণ্ডিত হইয়া উঠিয়াছে। ঐশ্বরিক শক্তি মানসিক শক্তির কাছে পরাভব মানিয়াছে। মানুষকেই তাঁহার কাব্যের নায়ক করিয়াছিলেন বলিয়া তাঁহার কাব্যে রাম ও লক্ষ্মণ হইয়াছে ভীরু, কাপুরুষ আর "মেঘনাদ, রাবণ, প্রমীলা, সুরমা প্রভৃতি এক একটি উজ্জ্বল তারকা রূপে চিত্রিত হইয়াছে।

প্রাচ্য এবং পাশ্চাত্য সাহিত্যের অপূর্ব্ব সম্মেলন ইহাতে ঘটিয়াছে কিন্তু তাহাতে ইহার কিছুমাত্র সৌন্দর্য্য হানি বা মৌলিকত্ববোধ নষ্ট হয় নাই। এই প্রসঙ্গে মধুসূদন প্রতিভার আর একটি দিক আলোচনা না করিলে তাঁহার কাব্য প্রতিভার সম্যক পরিচয় মিলিবে না।

পাশ্চাত্য সাহিত্য হইতে প্রেরণা পাইয়া, হোমার ভার্জিল প্রভৃতি হইতে উপাদান সংগ্রহ করিয়া মধুসূদন কাব্য রচনা করিয়া গিয়াছেন। তিনি পাশ্চাত্য সাহিত্য অনুসরণ করিয়াছেন বটে কিন্তু অনুকরণ করেন নাই। মধুসূদন ছিলেন যথার্থ জাতীয় কবি। তাই তাঁহার কাব্যের মধ্যে আমাদের জাতীয় জীবনের স্পন্দন অনুভব করিতে পারি। তাঁহার কাব্যের মধ্যে যে সকল নরনারীর সহিত আমাদের সাক্ষাৎ ঘটে তাহারা বিজাতীয় নহেন। জাতীয় প্রাণের উষ্ণ রক্তধারা তাহাদের মধ্যে প্রবাহিত। ভারতীয় নারীর যে সমস্ত গুণাবলী তাহার সব কিছুই আমরা সীতার মধ্যে দেখিতে পাই। কিন্তু প্রমীলা, বীরাঙ্গনা শৌর্য্যে, বীর্য্যে, প্রেমে সে ইউরোপীয় নারীর সমকক্ষ। তথাপি ভারতীয় নারীর যে স্বাতন্ত্র্য, যে বৈশিষ্ট্য, তাহাও তাঁহার চরিত্রে সম্পূর্ণ বিদ্যমান।

মধুসূদন প্রমীলাকে বীর্যবতী ও বীরাঙ্গনা করিয়া তুলিলেও প্রমীলা ভারতীয় ঐতিহ্য হইতে বিন্দুমাত্র ভ্রষ্ট হন নাই। তাই আমরা দেখিতে পাই যে ঐ বীরাঙ্গনা

শেষ পর্য্যন্ত আর্য্য কুলবধূর ন্যায় স্বামীর সহিত চিতা আরোহণে প্রাণত্যাগ করিলেন। বিধবার হাহাকার গগন বিদীর্ণ করিয়া তুলিল। মধুসূদনের মহাকাব্যের প্রধান বৈশিষ্ট্য এই যে তিনি ভারতীয় নরনারীর চরিত্র অঙ্কন করিতে কিংবা তাহাতে বিশিষ্টতা প্রদান করিতে গিয়া তাহাকে কখনও অ-ভারতীয় করিয়া তোলেন নাই।

নব যুগের বাংলা কাব্যের অপর লক্ষণ ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য। তাহাও মধুসূদনের কাব্যে আমরা উপলব্ধি করি। কবির আন্তর অনুভূতির অকৃত্রিম প্রকাশই কাব্যকে সার্থক করিয়া তোলে। জীবনের যে সত্যরূপ কবির হৃদয়কে স্পর্শ করে তিনি তাহাই কাব্যের মধ্যে বরণ করিয়া নেন। জগৎ ও জীবনের এই সত্য সুন্দর মূর্তিই তাঁহাকে মুগ্ধ করে এবং নিজের উপলব্ধির প্রেরণায় তাঁহার কবিমানস আশ্বস্ত হইয়া তাহার কাব্যসৃষ্টিতে উহা সার্থকতা লাভ করে। কবির ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য সম্পর্কে কবি-সমালোচক শ্রীযুক্ত মোহিত লাল মজুমদার তাঁহার 'আধুনিক বাংলা সাহিত্যে' লিখিয়াছেন: "সমগ্র জগৎ ও জীবনকে সম্পূর্ণ স্বাধীন স্বকীয় কল্পনায় অধীন করিয়া আত্মপ্রত্যয়ের আনন্দে আশ্বস্ত হওয়ায় যে গীতি প্রেরণা তাহারই নাম কবির ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্য।"

মধুসূদনের কাব্যের মধ্যে তাহার বাস্তব অনুভূতি সুস্পষ্ট প্রকাশ পাইয়াছে। বাংলা মহাকাব্যের কবির এই লিরিক-ধর্মী কবিতার মধ্যেও আমরা নবযুগের সাহিত্যের পদধ্বনি শুনিতে পাই।

বাংলায় ইটালীয় পদ্ধতিতে মধুসূদন লিরিক-ধর্মী সনেট লিখিয়াছেন "চতুর্দ্দশপদী কবিতাবলী।" কবি হৃদয়ের আশা আকাঙ্খা ও মনোভাব ইহার মধ্যে স্পষ্ট রূপে ফুটিয়া উঠিয়াছে। নিতান্ত অন্তর্নিহিত প্রতিভা দ্বারা মানবের জয়গান করিয়া একদিকে মধুসূদন যেমন বাংলা কাব্য সাহিত্যের নবযুগের পথিকৃতের কাজ করিলেন অপর দিকে কাব্যের মধ্যে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য প্রবর্তন করিয়া বাংলা সাহিত্যকে গতানুগতিকতার হাত হইতে রক্ষা করিয়া সাহিত্যের মধ্যে প্রাণপ্রতিষ্ঠা করিলেন।

এর পরেই আসিলেন হেমচন্দ্র এবং নবীন সেন। হেমচন্দ্রের রচনার অনেকস্থলেই কবিত্ব, সরলতা ও প্রাঞ্জলতার অভাব ছিল; আর নবীনচন্দ্রের মধ্যে আমরা লক্ষ্য করি সংযম ও সঙ্গতিবোধের অভাব। এজন্য উভয়ের কাবাই মহাকাব্য-পর্য্যায়ে উন্নীত হইতে পারে নাই।

তথাপি ঊনবিংশ শতাব্দীতে মধুসূদন, হেমচন্দ্র এবং নবীন সেন, প্রতিভাবান কবিত্রয়ের পর পর আগমনে বাংলা কাব্য সাহিত্য নবদীক্ষায় দীক্ষিত হইয়া নূতন পথ ধরিয়া অগ্রসর হইতে লাগিল। বাংলা সাহিত্যে স্বদেশ-প্রেমের যে মন্ত্র রঙ্গলাল ও ঈশ্বরগুপ্ত উচ্চারণ করিয়াছিলেন হেমচন্দ্র নবীনচন্দ্র আসায় সেই মন্ত্রের পূর্ণ প্রতিষ্ঠা ঘটিল। নূতন ভাবে কাব্য সৃষ্টি করিতে গিয়া বিশেষতঃ মহাকাব্য রচনার মধ্য দিয়া বাংলা গীতি-কাব্যের অক্ষুণ্ণতা অনেকাংশে কমিয়া যায়। এই সময়ে বিহারীলাল পুনরায় গীতিকাব্যের ধারাকে পুনর্জীবিত করিয়া তোলেন। যে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য ও আত্মপ্রত্যয়ের আনন্দ "মেঘনাদের" কবিকে কেবল মাত্র সাড়া দিয়াছিল, বিহারীলাল আসায় সর্বপ্রথম তাহা বাংলা কাব্যে বিকাশ লাভের পূর্ণসুযোগ লাভ করিল। "সারদামঙ্গলের" মধ্য দিয়া আমরা কবির অন্তর্লোকের সহজ ও বাস্তব অনুভূতির যে সুস্পষ্ট সুরের সন্ধান পাই পরবর্তী যুগে রবীন্দ্রনাথও সেই সুরেরই সাধনা করিয়া গিয়াছেন। আধুনিক বাংলা কাব্যসাহিত্যে কবিমনের যে অন্তর-তম বাসনা তাহা মাইকেলের "চতুর্দ্দশপদী" ও বিহারী লালের কাব্যে একটি স্পষ্ট রূপ পাইয়াছে। কবি আপন হৃদয়ে যে প্রেম, সৌন্দর্য্য অনুভব করিয়াছিলেন বাস্তব মূর্তিতে কবির নিকট তাহা ধরা পড়িয়াছে। কবিও গীতিকাব্যের ভাষা, ছন্দ মিলধারা এমন নিপুণ ভাবে তাহা সৃষ্টি করিয়াছেন যে তাহা অপূর্ব্ব সুষমামণ্ডিত হইয়াছে। বিহারীলাল নিজে যাহা উপলব্ধি করিয়াছেন

তাহার উপরই জগতের সৌন্দর্য্য স্থাপিত করিয়াছেন। গীতিকাব্যের যে স্পষ্ট আদর্শ তাহা বিহারীলালই সর্ব্বপ্রথম লোকচক্ষুর সম্মুখে তুলিয়া ধরেন। আধুনিক গীতিকবিতার পথপ্রদর্শক বিহারীলাল। বিহারীলাল কাব্যে যাহা সাধনা করিয়াছিলেন রবীন্দ্রনাথ তাহাতে পূর্ণসিদ্ধি লাভ করিয়াছেন।

রবীন্দ্রনাথ "আপন মনের মাধুরী মিশায়ে" তাঁহার সমগ্র কাব্য সৃষ্টি করিয়া গিয়াছেন। রবীন্দ্রনাথের বিশ্বজীবন এবং দেবতার আদর্শ মূর্ত হইয়া উঠিয়াছে। রবীন্দ্রনাথও তাঁহার জীবন দেবতাকে যে ভাবে অনুভব করিয়াছেন সেই স্পষ্ট সত্যটিকে কবিতার ভিতর রূপ দিয়াছেন। আমাদের জাতীয় জীবনে রবীন্দ্র প্রভাব যুগান্তর আনিয়াছে। রবীন্দ্রনাথের মধ্যে আধুনিক বাংলা কাব্যের একটি যুগের পরিসমাপ্তি ঘটিয়াছে। অতঃপর বাংলা কাব্য সাহিত্য কোন পথে বিচরণ করিতেছে তাহা আমাদের প্রবন্ধের আলোচ্য বিষয় নহে। সুতরাং সে আলোচনা অপ্রাসঙ্গিক বলিয়া বর্তমান প্রবন্ধটি এইখানেই শেষ করিলাম।

আত্মহত্যা

শ্রীকবিতা সিংহ—প্রথমবর্ষ (বিজ্ঞান)

ট্রামে উঠে পড়লো মেধা। মনটা ওর তিক্ত হয়ে আছে আকণ্ঠ বক্তৃতা শুনে। চৌরংগির রংবেরঙের ঝলমলে আলো আর শতলোকের শতরকম কোলাহল সুতীব্র হয়ে আঘাত করছে ওর পরিশ্রান্ত মস্তিষ্ককে। দুপাশে বিলাস দ্রব্যে ভরা দোকানগুলো আলোর জাল ফেলে যেন ধরতে চায়, লোভাতুর করতে চায় বেপথু পথিকদের। আর জর্জেটের মাঝে জড়সড় হয়ে বাঙালী পুরনারীরা অনভ্যস্ত পায়ে হীল-তোলা জুতো পরে খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে যায় রেস্তোরাঁ কাফে আর মেট্রো লাইট হাউসে। মনটা তিক্ত হয়ে আসে ওর কলেজের ধর্ম-ঘটের কথা মনে করে। সব থেকে বেশী অসহ্য লেগেছিল ওর তখন যখন বিখ্যাত কালোবাজারী বরুণ রায়ের মেয়ে সুছন্দা তার পান্নার ব্রেসলেট্ পরা ফুল-স্লীভ সাটীনের ব্লাউজে মোড়া সরু সাপের মত হাতে করে এগিয়ে দিয়েছিল সাম্যবাদের গরম গরম বুলিতে ভরা কাগজ খানা। সেদিন কিসের জন্য ধর্মঘট তা জিজ্ঞাসা করেছিল মেধা সুছন্দাকে। সুছন্দা আম্‌তা আমতা করে জবাব দিয়েছিল 'জাননা আজ ইয়ে—দিবস'—তারপর লজ্জা ঢাকতে মনোযোগ দিয়েছিল ষ্টেলা রায়ের জরির কাজ করা পেশোয়াজের উপর।

জনকয়েক কলেজের ছাত্র উঠলো 'টাইগারের' কাছ থেকে—সবে সিনেমা দেখে ফিরছে তারা। গ্যারী-কুপার ও ইনগ্রীড্ বার্গম্যানের নামের সংগে আর একটা কথাও মেধার কানে এসে লাগলো—'ভাগ্যিস্ আজকে ষ্ট্রাইক্‌টা হয়েছিল মাইরী, নইলে এতক্ষণ জি. টির ক্লাশে বসে বসে ক্যালকুলাস পড়তে হত।' মুখ তুলে দেখলো মেধা—কৈশোরের পরে তাদের দেহে তারুণ্য আসবার আগেই এসেছে বার্ধক্য···ভগবানের দেওয়া তারুণ্যের আশীর্ব্বাদ ওরা নিয়েছে অভিশাপ হিসাবে। ওরা যে প্রাপ্তবয়স্ক তা বোঝা যায় শুধু ব্রণ-লাঞ্ছিত অসমতল গাল আর সিগারেট পোড়া কালো-ঠোঁট দেখেই। নিজের দাদা তুষারের কথা ওর মনে পড়লো। মনে পড়লো

সেই গোলাপী সিল্কের হাওয়াইআন্ শার্ট পরা পাউডার চর্চ্চিত নারী সুলভ মূর্ত্তিটা। মাষ্টার মশাই-এর কথাটা ওর কানের কাছে গভীর হতাশার সুরে বেজে উঠলো আবার—'এমন ব্যাপক পতন যখন আসে মেধা, তখন জাতির ধ্বংস অবশ্যম্ভাবী'.....

মেধা বলেছিল—'তা কেন'?—দেশের তরুণ ছাত্র-ছাত্রীরা যে জেগে উঠছে, এই অন্যায়ের বিরুদ্ধে ধর্ম্মঘটই ত তার প্রমাণ।'

'না মেধা—এ জেগে ওঠা নয়, এ হলো মরবার আগের অসুস্থ মনের ছটফটানি, জানোইত, দুর্ব্বলতা যত বেড়ে যায়, তত বেড়ে যায় রাগ আর বোকামো।' বলেছিলেন মাষ্টার মশাই।

বাড়ীতে ফেরবার পথে শুভ-সন্ধ্যা জানালো শর্ব্বরী আর ইন্দ্রলতা···নামের বাহার যতটা ওদের, রূপের দৈন্য ঠিক ততটাই। ছাপাশাড়ীর বর্ণাঙ্কিত পুষ্পারণ্য আর পাথরের মালা ওদের অংগে ঠিক ততটা বেমানান যতটা বেমানান কোন রায়-বাহাদুর বা পুলিশ কমি-শনারের বাড়ীর ইদানীং স্বাধীনতা উৎসব। লেখাপড়ার কথা জিজ্ঞাসা করলে বছর পাঁচেক ধরেই জানিয়ে আসছে সামনের বছর ম্যাট্রিক দেবে। তবে গুণ আছে অনেক, প্রায়ই চ্যারিটী শো-তে 'ইনক্লাব' নৃত্য করে চমকে দেয় ওরা, আর মাথা হেলিয়ে গায় রবীন্দ্র প্রভাব মুক্ত বিলাতী সুরের গান,

'এপারে গলিটা নোংরা, ওপারে বাড়ী গুলো জমকালো'

একটা চ্যারিটী শো'র টিকিট গছিয়ে দিয়ে চলে যায় ওরা।···আরো খানিকটা এগিয়ে গেলে চোখে পড়ে অনিমা বারাণ্ডায় দাঁড়িয়ে আছে। মেধা ওর দিকে তাকিয়ে হাসে, অনিমা তার সুন্দর মুখটা প্যাচার মত গম্ভীর করে ভেতরে চলে যায়। কারণ ওর মা বারাণ্ডায় দাঁড়াবার হুকুম দিলেও হাসবার হুকুম তো দেননি। ইতিপূর্ব্বে সর্ব্বগুণসম্পন্না গৃহকর্ম্ম নিপুণা পাঁচ দিদির সসম্মানে বিয়ে হয়ে গেছে কেউ কোন দিন বলতে পারেনি—তারা বারাণ্ডায় দাঁড়িয়ে হেসেছিল—অনিমা কি করে সে সম্মানে কালি দেয়। এমন কি কলেজে প্রিন্সিপ্যালের কাছে আরো ঘর বাড়ানোর জন্যে যে আবেদন করা হয়েছিল, তাতে ও সই করেনি, কারণ বাবা বলে দিয়েছিলেন 'সই মানেই পুলিশ কেশ্, যে সই-ই সই করাতে আসুক করো না'। অথচ ও স্কুলে একবার গুড্ কণ্ডাক্টের প্রাইজও পেয়েছিল—নির্জ্জীবতার প্রাইজ। শর্ব্বরী আর ইন্দ্রলতার অতি প্রগল্‌ভতার মতই অনিমার এই নির্জ্জীবতা অসহ্য ও ভীতিজনক।

বাড়ী ফিরে এসে দরজার কড়া নাড়ে মেধা।—দরজা খুলে দেন পাড়ার এক মাসীমা। তাঁর স্থূলাংগ ধীরে থমকে আছে গোলাপী রংএর 'মানে না মানা' আর সবুজ রংএর 'উদয়ের পথে' ব্লাউজে। পানের রসে রাঙা দাঁত বার করে তিনি বলেন, ও মেধা, 'মঞ্জুশ্রী'তে নতুন একটা বায়স্কোপ এসেছে দেখতে যাবে নাকি,—বাব্বা, তিন দিন বায়স্কোপ দেখিনি, আর আসবার সময় অমনি একটা প্রহেলিকা সিরিজের বই কিনে আনতে হবে বুঝলে'—

মেধা দেশের মানুষদের নানা পরিবর্ত্তনের মাঝে কয়েকটা উন্নতি দেখেছে আজকাল। আগে মা মাসী পিসীরা ও বাড়ীর বিধবারা সন্ধ্যায় একটু ধূপধূনা জালিয়ে পূজা অর্চ্চনা করতেন; বর্ত্তমানে তাঁরা সিনেমায় সন্ধ্যা কাটান, হিন্দুস্থানী দেশওয়ালীরা কলকাতায় এলে ঠাকুরের পট কিনে নিয়ে যেত; এখন কেনে গগল্‌স্, আর জংগি আমেরিকানদের ফেলে-যাওয়া খাকী পোষাক, প্যারা-স্যুটের টুকরো,—ছাত্রছাত্রীদের আগে হাতে পয়সা থাকলেই ভালো বই কেনার বাতিক ছিল, এখন তারা যায় সিনেমার রূপালী পর্দ্দায় আর কাফে রেস্তোরাঁর বাসী পিঁয়াজ রশুনের সথে।

নীচের দালানে ইজিচেয়ারে অসুস্থা মা বসে ছিলেন, আর তাঁর কাছাকাছি দাঁড়িয়ে ছিল ছোট বোন শ্রদ্ধা গভীর অশ্রদ্ধায় দুই ভ্রূ কুঞ্চিত করে, হাতে ওর আয়না বসানো বিচিত্র কারুকার্য্য খচিত একটা ব্লাউজ্। মার বিরক্ত স্বর ওর কানে এল, 'আর কি পারা যায়, এই

সে দিন তোমার বন্ধুদের রিষ্ট্ ওয়াচ্ আছে অথচ তোমার নেই বলে কান্নাকাটি করে তিনশো টাকা দিয়ে ঘড়ী কিনলে আবার আজ বলছো কুড়ী টাকা দামের ব্লাউজ চাই···আর কি পারা যায়'···থমকে দাঁড়ালো মেধা··· সত্যি ছেলেমেয়েদের পোষাকের ঘটা দেখলে মনেই হয়না কলকাতা সহরের শতকরা শত জনই নিম্ন-মধ্যবিত্ত।

সন্ধ্যায় মাথাটাকে ঠাণ্ডা করবার জন্য স্নান করে নিল মেধা। ছাদের নরম অন্ধকারে এসে দাঁড়াল ও। ওপাশে বড় ঘরটায় থাকে ওর দাদা সুর-শংকর,—এযুগের রবীন্দ্র-প্রভাব-মুক্ত শ্রেষ্ঠ বামপন্থী বিপ্লবী কবি। শুনতে পেলো ও সুর-শংকরের নতুন কবিতার কয়েকটা ছত্র···

আমার মনের জ্যামিতিক মানচিত্রে
প্লাষ্টিক হয়ে জমে গেছে সব বেদনা—
এটম বোমার মত,·····

একটা উচ্ছল হাসির স্রোত ওর কণ্ঠ ঠেলে উঠতে চাইল। ···এই সব বস্তু সম্পাদকরা ছাপে কোন রুচিতে? কিন্তু হাসিটা আটকে গেল পাশের বাড়ীর বিলেত ফেরৎ সোনার ছেলের মদমত্ত মাতলামোতে।···হঠাৎ মেধার মাথাটা যেন ঘুরে উঠলো···মাতলামো···সমস্ত দেশটাই আকণ্ঠ পান করছে ভুলের মদ! আজকের দিনে শুধু একজনই অন্যায়কারী নয়, অন্যায়কারী সকলেই। শুধু একজন নীচে নামেনি, নীচে নেমেছে সবাই। পলিটিক্সের পাণ্ডা হয়েছে ঐ ধনী কন্যা সুছন্দার মত মেয়েরা, আর সেই সিনেমা ফেরৎ প্রগলভ ছাত্রদের মত ছেলেরা। অনিমা ইন্দ্রলতা শর্ব্বরীর মত মেয়েরা ভবিষ্যত ভারত-বর্ষের জন্মদাত্রী মা হবে একদিন। ওর মাসীমার মতন অর্দ্ধশিক্ষিতা মেয়েরা যাঁরা কোন রকম উচ্চাশার ধার ধারেন না তাঁরাও বর্ত্তমান ভারতের নাগরিকদের গড়ছেন ···আর ছোট বোন শ্রদ্ধার মত মেয়েরা কান্নাকাটী কটু কাটব্য দিয়ে অক্ষম পিতামাতাকে বিলাস দ্রব্য জোগাতে বাধ্য করছে ঘরে ঘরে। ওর দাদা সুর-শংকরের মত সবচেয়ে বড় সাহিত্যের অপমানকারী কালাপাহাড় এযুগের শ্রেষ্ঠ কবি হয়েছেন, আর পাড়ার বখাটে অরুণ মুন্সী রায় পিকাশোর ছবির ঘৃণিত নকল করে হয়েছেন এ যুগের শ্রেষ্ঠ শিল্পী। একটা দীর্ঘশ্বাস পড়লো মেধার কাঁধের পরে। চমকে তাকিয়ে দেখলো মেধা লালপাড় শাড়ী পরা ওর মায়ের অস্পষ্ট মূর্ত্তি। সংসারের জোয়াল কাঁধ থেকে ফেলে মা উঠে এসেছেন ছাদের মুক্ততায়···আশ্চর্য্য হয়ে যায় মেধা।

'বলতে পারিস্ মেধা, আমার ছেলে মেয়েরা কেন এমন হয়ে যাচ্ছে?'

মেধা মার মনের গভীর ব্যামো বুঝতে পারলো। ভালো করেই। মেধা জানে, জানে সবই জানে ও। —বড়দা ব্ল্যাক-মার্কেটিং করে, মেজদা মদ খায়, সেজদা মার গহনার বাক্স নিয়ে পালিয়েছে—বাবা বড় বিজনেস্-ম্যান্—ছেলেমেয়েদের উপর তার কোনো প্রভাব নেই, মাঝে মাঝে কাজের ভার থেকে মাথা তুলে তিনি সংসার খরচের টাকা ঢেলে দেন তাঁর টাকার বিরাট পাহাড় থেকে। মেধা মার নরম ক্ষীণ শরীরটা নিজের বুকে টেনে নেয়·· দুজনের নিঃশব্দ ক্রন্দনে রোমাঞ্চিত হয়ে ওঠে নৈশ আকাশ ···ওরা কাঁদে, ওরা দেখতে পায় এই নারকীয় ব্যভিচার-কলংকিত সমস্ত দেশটাকে, ওদের সংসারের মধ্য দিয়ে। ...মা ওগো মা, তুমি কি জাননা মা এযুগ অন্যায়ের,— এযুগের নতুন সাম্যবাদ হলো অন্যায়ের সাম্যবাদ। সবাই অন্যায় করছে, ভাই, বোন, বাপ, মা...মহত্বের আদর্শ সামনে নেই, নেই সত্যিকারের পথ দেখাবার আলো···কে বাধা দেবে ..মাষ্টার মশাই ঠিকই বলেছেন —'এ জাতি ধ্বংসের পথে'·····

'চলমা নীচে চলো...রাত হলো অনেকটা'···মেধা বলে·····

ওরা ফিরে গেল—···মেধা আর তার মা...ফিরে গেলো সেই অন্যায়ের আবর্ত্তে। নিঃশব্দ সন্ধ্যা ওদের আত্মহত্যার ব্যথায় কালো হয়ে গেল একটু।

কুচো মাছ

(এইচ্ ই বেট্স্)

অনুবাদক : অমিয় কুমার চক্রবর্তী
তৃতীয় বর্ষ (কলা)

ফি-শনিবার সকালে ইস্কুল মাষ্টার অস্‌বর্ণের শহরে যাওয়া চাই। সংগে নিয়ে যাবেন একমাত্র ছেলে এরিক-কে। উদ্দেশ্য, দুপুরের খাবারের জন্যে কিছু মাছ কেনা। এই বিশেষ দিনটির এই বিশেষ ভোজন-পর্বে কোনো না কোনো মাছের আইটেম থাকবেই। আজ পনের বছর অসবর্ণের ঘরে এই রীতিই চলে আসছে। প্লেইস এবং কড্ মাছ—এর মধ্যে ক্যালরী-মূল্য কোনটার কত ধারাপাতের নামতার মতোই অসবর্ণের তা মুখস্ত। নিজের মূল্য সম্পর্কে তিনি যেরূপ আস্থাবান, মৎস্য মূল্য প্রসংগে তাঁর বিশ্বাসও প্রায় তদনুরূপ। বেঁটেখাটো, চটপটে ফিটফাট লোকটি: গায়ে কালো কোট, মাথায় খেলোয়াড়ের কালো টুপি, আর গলদেশ ঘিরে বেশ করে কলপ দেওয়া একটা শাদা কলার—এই তাঁর পোশাক। নাকের ওপরে আবার স্প্রিংয়ের চশমা। দেখায় বেশ—ঠিক যেন একটি দাঁড়কাক। ছেলেটির চোখেও চশমা; কিন্তু তার জোড়া হ'য়েছে বেমানান। মোটা কাঁচ সোনার ফ্রেম; উজ্জ্বল অভিজাত দৃষ্টি। কিন্তু একটা শূন্যতা, কেমন যেন একটা ভয় মিশ্রিত তার চাউনি।

'আবার পকেটে হাত রেখেছে! আবার! আ-বার রে-খেছ!'

চলতে চলতে অসবর্ণ হঠাৎ আদেশ হাঁকলেন—যেন কোন অদৃশ্য 'ক্লাশ' কে উদ্দেশ করে বলছেন। আদেশ তো নয়, এরিকের পিঠে যেন চাবুক পড়ল। বছরের পর বছর অভ্যাসের ফলে, অসবর্ণের কথার স্বরটা আর শেষ হতে পায় না; তার আগেই ছিটকে বেরিয়ে পড়ে—ঠোঁট দুটো কাঁচির ফলার মত চট্ করে বুজে যায়। 'কোথায় যাচ্ছ, কো—থায় যাচ্ছ! পথ দেখে চলবে! কতবার একথা বলতে হবে, কতবার? পকেটে হাত রেখোনা।' হতবাক হয়ে গেল ছেলেটি। বাবাকে সে ভয় করে। বাবার আদেশ শোনার সঙ্গে সঙ্গেই পকেটের ভেতর থেকে হাত দুটো বের ক'রে আনছিল; কিন্তু পরমুহূর্তেই আবার যথাস্থানে। শুকনো ফ্যাকাশে দুটি হাত—ঠাণ্ডায় জমে গেছে। আঙুলের ডগাগুলোতে কোনো বোধ-শক্তি অনুভব করেনা এরিক। রাস্তার ফুটপাতগুলো তুষারে তুষারময়, ধুলো আর বরফে মাখামাখি হ'য়ে একটা কিম্ভূত শ্রী ধারণ ক'রেছে। মাঝে মাঝে তুষার-ঝাপটা এসে ছিড়েখুঁড়ে তছনছ্ করে দিয়ে কোথায় উড়িয়ে নিয়ে যাচ্ছিল এই জঞ্জাল স্তূপকে।

'পেরোও। সাবধান। সাবধানের মার নেই!'

রাস্তা পেরুল দুজনে। আচমকা একটা হাওয়ার ঝাপটা এসে বাড়ি মেরে গেল তাদের চোখেমুখে। এরিক হাত দুটো পকেটে পুরে দিয়ে এই তুষার ঝঞ্ঝার সঙ্গে যুঝে এগুতে লাগল। হঠাৎ বাবাকে মনে পড়তেই ভয়ে ভয়ে পকেট থেকে বের করে আনল হাত দুটো। এরিকের হাতে একটা হল্‌দে রঙের খড়ে তৈরী মাছের ঝুড়ি। ঝুড়িটা তার খোলা পা দুটোর উপরে এসে জোরে জোরে বাড়ি খাচ্ছিল। বাবা বড় বড় পা ফেলে হেঁটে চলেছেন—মুখে বেশ একটু গর্বিত ভাব। এরিক পেছনে পড়ে গেছে; জোর পায়ে হাঁটতে লাগল সে। ঝুড়িটাও অবিশ্রান্ত ভাবে বাড়ি খাচ্ছিল।

শেষ অবধি মাছের দোকানের সাক্ষাৎ মিলল। জোরে জোরে হেঁটে এসেও এরিক বাবার সঙ্গে পারল না—তিনি কখন দোকানের ভিতর ঢুকে পড়েছেন। দোকান ঘরটার সামনের দিকটা খোলা, সর্বত্র তুষারের ছাড়াছড়ি। চকচকে বরফের ভিতর থেকে মাছগুলো বের করে এনে কেটে কেটে রেখে দেওয়া হয়েছে। বাবা দোকানে ঢুকে পড়ে মাছের দরদাম করছেন, এই অবসরে এরিক তার হাত দুটো আবার পকেটে পুরল।

'ওহে, কি মাছ? দেখিনা কি মাছ তোমার? টাট্‌কা-ফাট্‌কা কিছু আছে?

'এই যে খাসা হেক বাবু।'

'হেক! হেক! কেন, স্প্র্যাট নেই? কত ক'রে?

স্প্র্যাট্ অনেক সস্তা! অসবর্ণ যেন বলেছিলেন: উনপঞ্চাশের বর্গমূল যা হয়, তাতে পারনা দিতে? কি হে কত, দাম বলছ? শুনিনা কত? জল্‌দি বল, জল্‌দি! কেবল তোমাকে নিয়ে থাকলে তো চলবে না আমার।

মাস্টার-বৃত্তিসুলভ সন্দিগ্ধতা সহকারে অসবর্ণ মাছের ওজন লক্ষ্য করছিলেন,—যেন গণিতের দুরূহ কোনো প্রশ্নের সমাধান করছেন, একচুল এদিক ওদিক হয়েছে কি এক্ষুণি মাছওয়ালাকে নিয়ে পড়বেন। মাছওয়ালা ওজন শেষ করে নিঃশব্দে চারা মাছটাকে কাগজে জড়িয়ে দিল। তার সমস্ত বাকশক্তি লোপ পেয়ে গেছে।

'খোকা! এরিক! এদিকে আয় শিগ্‌গির।'

এরিক এগিয়ে গেল; যেতে যেতে সে ঝুড়ির মুখটা খুলবার চেষ্টা করছিল। কিন্তু খুল্‌বে কি করে? একেবারে থতমত খেয়ে গেছে, আঙুলগুলোতেও কোনো বোধ শক্তি নেই।

'গর্দ্দভ!'

অসবর্ণ তার হাত থেকে ঝুড়িটা ঝট করে কেড়ে নিয়ে মুখ খুলে ধরলেন: দোকানদার রূপোর মত চকচকে মাছের চারাটা তার ভিতরে পুরে দিল। এরিক হতভম্বের মতো দাঁড়িয়ে রইল একপাশে। চশমার পুরু কাঁচের উপরে এসে ছবি পড়েছে তুষার-ঢাকা দোকান ঘরটার আর সদ্য কেনা বরফ দেওয়া রূপোলী মাছটার। তার ফলে মনে হচ্ছিল, তার চোখদুটি বুঝি দৃষ্টিহীন হ'য়ে গেছে। অসবর্ণ দাম চুকিয়ে দিয়ে বেরিয়ে এলেন। এরিকও তাঁর পিছন পিছন হাঁটতে লাগল।

'ঠাণ্ডা লাগছেনা?'

'একটু একটু।'

'ও কিছু নয়। জোরে চল্। রক্ত চলাচল হোক্। আমার সংগে সংগে হাট্।

ছেলেটি নিঃশব্দে তার বাবার সংগে পা ফেলে চলতে চেষ্টা করল। হঠাৎ তার মনে হ'ল বাবা যেন উদ্দেশ্য বশতই জোরে জোরে হাঁটছেন। সে-ও যেমনি একটু জোরে হাঁটতে সুরু করছে, মাঝের ঝুড়িটা অমনি তার গায়ের উপরে এসে অনবরত বাড়ি খেতে লাগল।

হঠাৎ এরিকের মুখ থেকে দুটো কথা বেরিয়ে গেল; কিছুতেই চেপে রাখতে পারছিল না। তার বাবাও শুনতে পেলেন। আর এক মুহূর্তের জন্যে অসবর্ণের সমগ্র সত্তাকে কে যেন একটি মনুষ্যোচিত হৃদয়রসে সিক্তিত করে দিয়ে গেল।

'আয়, একটা কিছু খেয়ে নি।'

অসবর্ণ থেমে পড়ে চারিদিকে তাকাতে লাগলেন।

'পেয়ো।'

রাস্তা পেরুল তারা। অসবর্ণ আগে আগে, পেছনে এরিক। দেখতে না দেখতে একটা রেস্তরাঁয় এসে ঢুকল দুজনে। এরিক এতেই খুশি হয়েছে: এখানে ঠাণ্ডা নেই একটুও, যেমনি গরম তেমনি সুন্দর চায়ের গন্ধ। টেবিলের উপর কনুই রেখে বসে বসে হাত ঘষ্‌তে লাগল এরিক।

'কনুই রেখেছ।'

রেস্তরাঁর পরিচারিকা এল। বাড়ির চাকরবাকরদের সংগে এরিক বাবাকে যে রকম ব্যবহার করতে

দেখেছে, এর সংগে তিনি ঠিক সেই রকম ব্যবহারই করলেন। সে যেন অতি নগণ্য জীব, একটা কথা বলারও অযোগ্য।

'দু পেয়ালা কোকো। জল্‌দি।'

পরিচারিকা চলে গেল। চুপচাপ বসে রইল দুজনে। এরিক কোলের উপরে হাত দুটো সরিয়ে নিয়ে বাবা না দেখতে পান এমনি ভাবে আস্তে আস্তে ঘষল খানিকক্ষণ। তারপর, চশমার কাঁচ দুটো ভিজে ভিজে হয়ে উঠেছে বুঝতে পেরে চোখ থেকে চশমা নামিয়ে রুমাল দিয়ে আস্তে আস্তে মুছতে লাগল। ভারী ক্লান্ত চোখ দুটি। চশমার চাপে গালের উপর দিকটার এবং নাকের হাড়টার উপরে কেমন লাল দাগ পড়ে গিয়েছে। চোখে চশমা না থাকার এই রেস্তরাঁ শুদ্ধু সমস্ত জগৎটা তার কাছে মনে হচ্ছিল একান্ত অপরিচিত মায়াময়—মাঝখানে যেন একটা ছেদ পড়ে গিয়েছে—একটা অস্পষ্ট কুয়াসাচ্ছন্ন অনুভূতির জগৎ, আবছা অথচ সুন্দর।

এক মনে চশমা সাফ করছে এরিক। মাঝে মাঝে আবার আলোর সামনে ধরে ঘাড় কাত্‌ করে দেখছে, ঠিক সাফ হ'ল কিনা। এমন সময় পরিচারিকা কোকো নিয়ে এল। অসবর্ণ নিঃশব্দে তার আপাদমস্তক খুঁটিয়ে দেখতে লাগলেন। তারপর, সে চলে যেতেই হঠাৎ তাকে ডাক দিলেন, পরিচারিকা সোজা চলে এল।

'এটা দিয়েছ কি ?' —মেয়েটি চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল, একেবারে থ হয়ে গেছে। 'জিজ্ঞেস করি কি এটা ?'

'কোকোটা—কোকোটা এখনো মেশেনি, স্যর।'

'বদলে নিয়ে এস।'

'এক্ষুনি মিশে যাবে, ঠিক হ'য়ে যাবে, স্যর। এক্ষুনি ঠিক—'

'নিয়ে যাও। বদলে নিয়ে এস ?'

অসবর্ণের কণ্ঠস্বর আদেশে গম্ভীর হ'য়ে উঠল। যেন তিনি মুহূর্তের জন্যে নিজেকে ভুলে গেছেন, মনে করেছেন, রেস্তরাঁটাই তাঁর ক্লাশঘর। চেয়ার ছেড়ে প্রায় দাঁড়িয়ে প'ড়ে চেঁচিয়ে উঠলেন তিনি। রেস্তরাঁর সবাই বিস্মিত হ'য়ে তাঁর দিকে চেয়ে রইল। কেবল পরিচারিকাটিই অন্যমনস্ক, কোকো দু পেয়ালা ফিরিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। এরিকের চশমা মোছাও থেমে গিয়েছে। একটা অস্বস্তি নিয়ে মুখ নীচু করে বসে রইল সে। বাবার ব্যবহারে সে ভয়ানক লজ্জিত হ'য়েছে; তার উপরে খুব ভয়ও হচ্ছিল। বাবার দিকে মুখ তুলে তাকাবার সাহসও হচ্ছিল না তার। রাগে অসবর্ণের ভ্রূ কুঁচকে উঠেছে—গুম্‌ হয়ে বসে রইলেন তিনি। ভাবখানা এই, যেন তিনিই রেস্তরাঁর মালিক। হঠাৎ ছেলেটি ইচ্ছে ক'রেই রুমালটা টেবিলের নীচে ফেলে দিল। রুমালটা তুলবার জন্যে মাথা নীচু করতেই ঝুড়ির ভেতরকার স্প্র্যাট মাছটার গন্ধ এল নাকে। কই, তেমন বিশ্রী ঠেকলোনা তো গন্ধটা ? রুমালটা তুলে এরিক চোখে চশমা চাপাল—অনবরত তার চোখের পলক পড়ছে। অসবর্ণের চোখেমুখে একটা অনমনীয় কর্তৃত্বের ছাপ অংকিত হয়ে আছে। রাগে তাঁর সর্বাংগ কাঁপছিল। একটু নড়ে বসার কি মুখ ফুটে একটা কথা বলারও সাহস হচ্ছিল না এরিকের। আর কোনদিন সে এত ভয় খায়নি। কারুর সামনে মাথা নীচু করবেন না, সবার উপরে প্রভুত্ব করবেন, কখনো বা হঠাৎ রেগেমেগে উঠে সবাইকে হক্‌চকিয়ে দেবেন—অসবর্ণের স্বভাবই এই। আজ পাঁচ বছর এরিক তার বাবার এই একই ধারার ব্যবহার দেখে আসছে। অসবর্ণ নিজেকে কোনদিন প্রশ্ন করে দেখেননি, তাঁর এই রকম নাটকীয় উষ্মাপ্রকাশের সত্যিই কোনো যৌক্তিকতা আছে কিনা; অন্য সবাইও চিরদিন মুখ বুজে সহ্য করে গেছে। সর্বত্র তার বাবা যা ক'রেছেন, ঠিক ক'রেছেন। তা যে বেঠিক হ'তে পারে, একথা বলার মত সাহস কারুর কোনদিন হয়নি। এরিকের নিজের বিশ্বাসও তাই। বাবা যা বলেন তা স্বতঃসিদ্ধ, কোনক্রমে তার ব্যতিক্রম হওয়ার জো নেই।

পরিচারিকা এখনও ফেরেনি। দুজনে চুপচাপ বসে

রয়েছে। হঠাৎ এরিক লক্ষ্য করল, তার বাবার মুখের ভাব আর আগের মত নেই, কোথায় যেন একটা পরিবর্তন হ'য়ে গেছে। চোখমুখের ক্রোধ কোথায় উঠে যাচ্ছে, সেখানে এসে ক্রমশঃ জমা হ'চ্ছে একটা অধীর অস্থিরতা। চোখ কুঁচকে রেস্তরাঁ বরাবর তাকিয়ে আছেন অস্‌বর্ণ, মাঝে মধ্যে চকিত দৃষ্টিতে ভয়ে ভয়ে কাউকে যেন লক্ষ্য করছিলেন।

'এরিক! ঠিক হ'য়ে বোস্, সোজা হ'য়ে! রেঁস্তোরা সোজা তাকা দেখি! ধূসর রংয়ের ওভারকোট গায়ে লোকটিকে দেখতে পাচ্ছিস্? কোণের ঐ মস্ত লোকটিকে?

'হাঁ।'

'কে জানিস? ওয়াইওহাম। জিলা শিক্ষা পরিষদের সভাপতি। তাকাসনে ওদিকে।'

এরিক টেবিলের নীচে চোখ ফিরাল।

'শিক্ষাজগতে উনি একজন মস্ত লোক! ঠিক হ'য়ে বোস্, ঘাড় সোজা ক'রে—ঘাড় সো-জা। হয়তো আমাদের কাছে এক্ষুনি চলে আসবেন, কথাবার্তা বলবেন। কি জানি, আসতেও পারেন।'

পরিচারিকা আবার কোকো নিয়ে এল। অস্‌বর্ণের সেদিকে বড় একটা ভ্রূক্ষেপ নেই; অন্যমনস্কভাবে যন্ত্র-চালিতের মত তিনি চামচে দিয়ে কোকো নাড়তে লাগলেন। রেস্তরাঁ সোজা তাকিয়ে রয়েছেন অসবর্ণ, কোন সুযোগে মস্ত ওভারকোট গায়ে লোকটির একটু দৃষ্টি আকর্ষণ করবেন। শিক্ষা-সভাপতি চা খেতে খেতে নিশ্চিন্তে সকালবেলার কাগজটা পড়ছিলেন। মাষ্টার-মশাই তাঁর প্রতিটি ভাবভংগী বিশেষভাবে নজর ক'রে দেখতে লাগলেন। আবার শহরে এলেন কেন? কিছু হ'য়েছে নাকি?—অস্‌বর্ণের মনে নানা রকমের আশংকা, মুখের উপরেও তার প্রতিফলন পড়তে লাগল। এক্ষুনি যদি উঠে আসেন আমার কাছে, কি হবে তবে? উঃ, সে আমার কত বড় সম্মান……আমার জীবনে চির-স্মরণীয় হ'য়ে থাকবে সে মুহূর্তটি…সেই মস্ত লোকটি যতবার খবরের কাগজটা ওল্টাচ্ছিলেন, ততবারই অস্‌বর্ণ জোরে জোরে ছেলের সঙ্গে কথা বলছিলেন, নয়তো সশব্দে কাশ দিচ্ছিলেন। কিন্তু মস্ত লোকটি একবারও তার দিকে ফিরে তাকালেন না। অস্‌বর্ণ একদৃষ্টে চেয়ে রইলেন সেই দিকে, মাঝে মাঝে কোকো নাড়তে নাড়তে কী যেন ভাবতে লাগলেন। যদি আমাকে চিনতে পারেন? আমাকে লক্ষ্য ক'রে থাকেন? অনুগ্রহ ক'রে যদি আমার কাছে চলে আসেন, কী হবে তবে?

ছেলেটি একমনে কোকো খাচ্ছিল। চশমার স্বচ্ছ কাচের ভেতর দিয়ে পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছে বাবার মুখখানা। তাঁর চোখেমুখে যে কী পরিবর্তন দেখা দিয়েছে, তা বেশ বুঝতে পারল সে।—রাগের চিহ্নমাত্র নেই, তাঁর সেই চিরদিনের হাম-বড়া কর্তৃত্বের ভাব কোথায় নিঃশেষে লুপ্ত হ'য়ে গেছে। অস্‌বর্ণ যেন শুকনো ফলের মতো একেবারে চুপসে গেছেন। তাঁর সমগ্র অন্তরাত্মা কোণের ঐ মস্ত লোকটির একটু দৃষ্টি আকর্ষণ করবার জন্যে উন্মুখ হ'য়ে আছে। তাঁর অন্তরের একমাত্র কামনা, উনি একটু ফিরে তাকান।—কামনা নয়, সকরুণ মিনতি।

সময় কাটতে লাগল, কিন্তু কিছুই ঘটলো না। পিতাপুত্রে কোকো খাওয়া শেষ করে উঠে দাঁড়ালেন। এবারে যেতে হয়!

'টুপিটা সোজা করে নে। এবারে ঠিক হয়ে দাঁড়া। বেরোবার সময় ঝট্ করে মাথা থেকে টুপিটা নামিয়ে নিবি, বুঝলি? তাঁর চোখে পড়বেই পড়বে! ঠিক সেই মুহূর্তে নামান চাই।'

অস্‌বর্ণ কোকোর দাম চুকিয়ে দিলেন। মাছের ঝুড়িটা হাতে নিয়ে ঠিক হয়ে দাঁড়াল।

'ঝুড়িটা তেরছা ক'রে ধরেছিস কেন? ওটা বাঁ হাতে নে, বাঁ-বাঁ! ডান হাত দিয়ে টুপিটা নামিয়ে নিবি। সাবধান, ভুল হয়না যেন।'

পিতাপুত্রে রেস্তরাঁ ঘরে দরজার দিকে এগুতে

লাগল। অসবর্ণ তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে কোণের লোকটিকে লক্ষ্য করছেন; এরিক চলেছে বাবার পিছু পিছু। তার দৃষ্টিও ঐ একই দিকে। তারা দরজায় পৌছুতেই মস্ত লোকটি হঠাৎ সশব্দে কাগজটা ওল্টালেন। অমনি চট্ ক'রে অসবর্ণ তাঁর খেলোয়াড়ের টুপিটা মাথায় চাপালেন; এরিকও এক পলকের মধ্যে তারটা নামিয়ে আনল।

মস্ত লোকটি তাদের দিকে ফিরেও তাকালেন না। নিঃশব্দে মাথা নীচু ক'রে তারা বেরিয়ে এল। বাইরে তখন হাওয়ার ঝাপটায় ঝাপটায় তুষাররাশি ছত্রাকার হ'য়ে যাচ্ছিল দিগ্বিদিকে। ক্রোধে, নৈরাশ্যে অসবর্ণ হঠাৎ জোরে জোরে পা ফেলে চলতে লাগলেন। যন্ত্রচালিতের মতো গমগম করে দ্রুত হেঁটে চলেছেন, কোনোদিকে ভ্রূক্ষেপ নেই। থেকে থেকে ছেলের দিকে তাকিয়ে খেঁকিয়ে উঠছিলেন: সংগে "সংগে হাঁটতে পারিস না"?

একান্ত বাধ্যজীবের মতো ছেলেটি ভয়ে ভয়ে দ্রুতপায়ে হেঁটে চল্‌ল। মাঝে মাঝে সে বাবার দিকে তাকিয়ে দেখছিল—চশমার স্বচ্ছ কাচের ভেতর দিয়ে পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছে বাবার মুখখানা। হঠাৎ এরিকের চোখ দুটো কুঁচকে উঠল। কেন? সে বোধহয় তার বাবার ভেতর নতুন কিছু দেখতে পাচ্ছিল —নতুন কিছু যা কোনদিন আর তার চোখে পড়েনি।

মহাকালের আত্মকথা

শ্রীকালী সাধন মুখোপাধ্যায় প্রথম বর্ষ (বিজ্ঞান)

আমি মহাকাল.....

এগিয়ে চলেছি সামনের দিকে সৃষ্টিকে ভেঙ্গে চুরমার করে। শুধু সৃষ্টিকে ভেঙ্গে চুরমার করাই আমার কাজ নয়। ধ্বংসের সাথে সাথে আমি তোমাদের দিয়ে যাচ্ছি নতুন সৃষ্টির ইঙ্গিত। আমি রুদ্র। আমার ললাট-বহ্নি-শিখায় পুড়ে ছারখার হয়ে যাবে যুগ যুগান্তরের সঞ্চিত যত আবর্জ্জনা। গতি আমার দুর্ব্বার; পথ অশেষ; পাথেয় শুধু মনের খেয়াল আর চলার নেশা। এ চলার শেষ কবে হবে আমিই তা জানিনা। প্রতি পদক্ষেপে ধরণীর বক্ষ ওঠে কেঁপে। আশঙ্কায় তোমাদের বুক দুরু দুরু করে কেঁপে ওঠে!

ঈশান রাঙা হয়ে উঠেছে। ঝড় উঠবে। সমুদ্রেও উঠেছে ভীষণ তুফান। আগ্নেয়গিরির চূড়ার আগুনে আকাশটা লাল হয়ে উঠেছে। শুনতে কি পাচ্ছ আমার পদধ্বনি? আমি আসছি। পদভরে টলমল করে উঠছে ধরণী। ভয়ার্ত্ত ধরণী বারে বারে তাই উঠছে কেঁপে। ভূমিকম্প! হ্যাঁ ভূমিকম্প; সব হয়ত এখুনি ভেঙ্গে চুরমার হয়ে যাবে। সেই ধ্বংসলীলার ওপর পা ফেলে আমি এগিয়ে যাব। আমার প্রতি পদক্ষেপে এমনি করে কত সৃষ্টি ধ্বংস হয়ে গেছে এবং আরও কত হবে। ধ্বংসাবশেষের ওপর পা ফেলে চলেছি। চরণ আমার ক্ষত বিক্ষত। তবু চলব মত্ত হস্তীর মত পা ফেলে। কেউ আমায় রোধ করতে পারবে না। চলার পথের সমস্ত বাধাকে এমনি করেই আমি পা'য়ে দলে যাব।

আমি চলব অবিরাম গতিতে। থামলে আমার চলবে না। সভ্যতার পর্দ্দার অন্তরালে অসভ্যতা যখন লাভ করে চরম বিকাশ তখনই হয় আমার প্রকাশ। সে সভ্যতাকে, সে কৃষ্টিকে ধ্বংস করতেই আমি এগিয়ে আসি।

হারকিউলিয়াম আর পম্পাই! চমৎকার দু'টো শহর আর চমৎকার সেই দেশ যে দেশের শহর ও দু'টো। সভ্যতার চরম শিখরে নাকি তারা উঠেছিল। কিন্তু লক্ষ্য করে কি দেখেছ ও দেশের সভ্য মানুষগুলোর মন কত অসভ্য ছিল? তারা মানুষ হয়েও মানুষকে ক্রীতদাস করে রাখত। সভ্যতার চরম শিখরে উঠেছে বলে গর্ব্ব করলেও তারা আসলে নেমে এসেছিল অসভ্যতার সর্ব্বনিম্ন ধাপে। তাই তাদের পশ্চাতে দাঁড়িয়ে সেদিন হেসেছিল 'ভিসুভিয়স'। গ্রীসও ওই একদোষে একদিন আমার করাল গ্রাসে এসে পড়ে। আমি বিদ্রোহী। আমার বিদ্রোহ সৃষ্টির মাঝে অন্যায়, অবিচার আর বিশৃঙ্খলতার বিরুদ্ধে।

আমি উন্মাদ, উন্মত্ত। তবু আমার চলার মাঝে ছন্দ আছে। পা ফেলি তালে তালে। আমি যেখানে পা ফেলি সেখানকার সমস্ত চিহ্ন আর স্মৃতিকে বিলুপ্ত করে দি' চিরদিনের জন্য। তোমরা মানুষ; সৃষ্টির সেরা জীব; মাটি খুঁড়ে তোমরা খুঁজে বার করেছ হারকিউলিয়াম আর পম্পাইএর অস্তিত্বকে।

কৈফিয়ৎ? সৃষ্টি কর্ত্তার কাছে এর জন্য কৈফিয়ৎ দিতে হবে আমাকে? না···না। কৈফিয়ৎ আমায় দিতে হবে না। কৈফিয়ৎ দেব কেন? আমি নিজেও যে তাঁরই সৃষ্টি। তাঁর প্রাচীন সৃষ্টিকে ধ্বংস করে নতুন সৃষ্টির পথ প্রশস্ত করবার জন্যই ত তিনি আমায় সৃষ্টি করেছেন। আমি যে ধ্বংসের দেবতা। লক্ষ কোটি প্রাণের ব্যাকুল আর্ত্তনাদ আমায় বিচলিত করতে পারে না। পাষাণ, না, না···পাষাণ নয়, পাষাণের চেয়ে আরো কঠিন হৃদয় আমার, ওদের আর্ত্তনাদে একটুও কাঁপে না। সংকল্পে আমি অটল। আমার ভয়ঙ্কর মূর্ত্তি কল্পনা করতেও তোমরা ভয় পাবে। ভয়ঙ্কর হলেও আমার সৌন্দর্য্য আছে; আমি সুন্দর। সুন্দরের পূজা কর তোমরা তাই আমিও পাই তোমাদের পূজা।

রুদ্র ডমরু বাজছে আর ধক্ ধক্ করে জ্বলছে আগুন, আমার চলার পথের বাঁশী আর আলো। আমি যাই। আমার চরণ-চিহ্ন-লাঞ্ছিত কালের পৃষ্ঠার দিকে একবার তাকিয়ে দেখ কেমন তালে তালে আমি পা ফেলে চলেছি।

আমি যে মহাকাল·····

———

কালেজ

শ্রীসুস্নাত গংগোপাধ্যায়
প্রথম বর্ষ (বিজ্ঞান)

স্বপ্নিল চোখ হ'তে মুছে ফেলে কৈশোর-মোহাবেশ,
পিছে ঠেলে' পৃথিবীর সবুজ স্বপ্ন-সমারোহ-রেশ,
এখানে পেয়েছি আমি অবারিত জীবনের আস্বাদ ;—
নতুনের বন্যাতে চূর্ণিত পুরাণোর মজা বাঁধ !
মনে পড়ে, কৈশোরে বুনেছিনু কল্পনা-মায়াজাল,
চিত্তের সিন্ধুতে তুলেছে সে তরংগ উত্তাল,—
স্কুলের কয়েদখানা ভেঙে কবে ছাড়া পাবে মোর মন,
ছিঁড়ে যাবে শাসনের সুকঠিন অকরুণ বন্ধন।
তারপর একদিন সমাগত হ'ল সেই শুভ দিন ;—
নিঃশেষে শুধে দিয়ে স্নেহময় পৃথিবীর প্রীতি-ঋণ
কম্পিত পদে আমি ধরেছি যে অজানা নতুন পথ,
মুখে নিয়ে কর্মের অবিচল সুদৃঢ় এ' শপথ।
এ' নতুন ধরা যেন রহস্যে ভরপুর মায়ালোক,
ধীরে ধীরে ফোটে আজ প্রজ্ঞার অস্ফুট সে অশোক ;
অনুভব করি আজ উদ্দাম জীবনের স্পন্দন,
দূর হ'তে শুনি আজ বিদ্যার সিন্ধুর গর্জন।
তারপর দিন কাটে, চোখ হ'তে মুছে গেছে মায়ারেশ,
পরিচিত হ'য়ে গেছে এখানের অভিনব পরিবেশ,
রহস্যে ভরপুর পাঠাগার এনে দেয় শিহরণ,
জ্ঞানের কাননে শুধু করেছি নতুন ফুল আহরণ।
সম্মুখে দেখি আজ প্রজ্ঞার বিস্তৃত পারাবার,
অঞ্জলি ভরে' আজ পান করি' সুস্বাদু বারি তার।
পৃথিবীর মনীষীরা এই পথে আমাদের সহচর,
তাঁদের চিন্তাধারা গ'ড়ে তোলে আমাদের অন্তর ,
তাঁদের সবার হাতে প্রজ্ঞার দীপশিখা প্রোজ্জ্বল,—
দীপ্তিতে দূরীভূত অজ্ঞান আঁধারের কজ্জল।
পৃথিবীর সাথে আজ আমাদের সুনিবিড় সংযোগ,
সম্ভাবনায় ভরা জীবনেরে করি' আজ সম্ভোগ।
পেয়েছি পথের সাথী, রেখেছি তাদের হাতে মোর হাত,
তাহাদের সাথে মোর ঘটে কত চিন্তার সংঘাত ;
কারো মাঝে আগামীর বিজ্ঞানী লেখকের প্রতিরূপ,
চারিদিকে যেন মোর ভবিষ্য ভারতের ভাবী রূপ !
তবুও তাদের মাঝে রয়েছে লুকিয়ে কিছু অশোভন,—
কেহ বা বেসেছে ভালো, করেছে আমারে কেহ প্রতারণ ;
কাহারো স্নেহের ভাষে ভুলেছি সকল হীন ক্ষতিক্ষয়,
কাহারো সংগে শুধু হ'য়েছে তিক্ত ঘাত বিনিময়।
অধ্যাপকেরা সবে করেছেন উৎসাহ বাণী দান,
বিনিময়ে জানি মোরা পারিনি ক' দিতে তার সম্মান।
তবু জানি, হেথা এসে চিনেছি যে মানবের পারাবার,—
আমার আগামীকাল তার' পরে রূপ নেবে আপনার ;
এখানে যে জ্ঞান আর শিক্ষারে করলাম সঞ্চয়,
ভবিষ্য জীবনেতে হ'বে নাক' জানি তার অপচয়।
এখানে পেয়েছি আমি রং-চটা জীবনের নব সুর,
মনেতে হয়েছে বোনা অনাগত সমাজের অংকুর ,
এখানে দু'চোখ ভরে' দেখেছি আকাশ-ছোঁয়া স্বপ্ন,
'বড়ো হ'বো,'—এই আশা করে আজ আমাদের মগ্ন,
একদিন চলে যাব পথের পাথেয় করে' সঞ্চয়,
এখানের ইতিহাসে অতীতের 'আমি' রবে অক্ষয় !
বিশ্বের পটভূমি যদিও মোদের করে পরিহাস,
তবু দীপ জ্বালে নর-মানসের শাশ্বত ইতিহাস !

———

হাতিয়ার

—শংকর চট্টোপাধ্যায়

প্রথম বর্ষ (কলা)

জীবনে এল বান—শুধু সনাতনের নয়, গ্রামের প্রায় অর্দ্ধেক লোকের জীবনে। পাগলা ঝড়ের মতন কে ভেঙে গুঁড়িয়ে দিয়ে গেল সকল কিছু···বর্তমান··· ভবিষ্যত···আশা···ভরসা পিতৃপিতামহের আবাসটুকুও বিপন্ন। নিরাশ্রয় মানুষরা পা বাড়াল অনিশ্চিত ভবিষ্যতের আঁধার পথে। বিভক্ত দেশের অসহায় গরীব মানুষ তারা। কিছুই তাদের করবার নেই। আকস্মিক দুর্যোগের জন্য প্রস্তুত ছিল না কেউই, সাবধান হতে পারে নি তারা। আর কিই বা করবে তারা···কি বোঝে বা এসবের; চিরদিন নীরবে সব সহে এসেছে এতটুকু প্রতিবাদ করেনি। এবারও তার ব্যতিক্রম হল না··· নিজেদের দুর্ভাগ্যের উপর সকল কিছু ভিত্তি করে তারা এবারও মেনে নিল এতবড় দুর্যোগকে নীরবে।

কিন্তু এ আকস্মিক দুর্ঘটনায় অবাক বনে গেল সনাতন। হিন্দু-মুসলমানের মারামারির জন্যই নাকি এই ব্যবস্থা। কিন্তু তাদের মধ্যে কোন দিন ত এসব হয় নি। সনাতনের মনে পড়ে আসবার দিনও জাফর তাকে কত বুঝিয়েছিল। কিন্তু বোঝে নি সনাতন। ইউনিয়ান বোর্ডের চেয়ারম্যান সাহেবের কথা মত তারা অজানা অচেনা দেশের উদ্দেশ্যে পা বাড়িয়েছিল।

হাঁটতে হাঁটতে বেলা পড়ে আসে। আকাশে বাতাসে ছড়িয়ে পড়ে অস্তমান সূর্যের আভা। রাত্রের মত তারা জায়গা করে নেয় বুড়ো বট গাছটার নীচে। যেখানে এখন থেকেই জড়ো হয়েছে অন্ধকার। চারিপাশে নেমেছে বটের ঝুড়ি। আগুন জেলে তারা চারিপাশে ঘিরে বসে। সবার মুখেই পড়েছে দুশ্চিন্তার কালো ছাপ। কত যেন বুড়ো দেখাচ্ছে এক এক জনকে। কারও মুখে কথা নেই। অকস্মাৎ পরিজন-বিয়োগের ব্যাথার মত চুপ মেরে গেছে সবাই। বাচ্চাগুলোও সময় বুঝে চুপ করে গেছে। বউ ঝিরা মুখোমুখি চুপ করে বসে আছে। হতভম্ব হয়ে গেছে তারা। জীবনের কোন অসতর্ক মুহূর্তেও তারা কল্পনা করতে পারে নি এরকম অবস্থাকে।

আগুনের ছোট্ট লিক্‌লিকে শিখাগুলো আর চারিপাশের কালো অন্ধকার সনাতনের এলোমেলো বিশৃঙ্খল মনকে জাগিয়ে তোলে। কত কথাই ভাবতে থাকে। কত ভুলে যাওয়া দিনের কত সব কথা সনাতনের মনের দোর গোড়ায় এসে ভীড় করে দাঁড়ায়। অজানা ভয়ে কাঁপুনি লাগছে তার মনে···কেমন করে সে বাঁচবে! আজকের জীবনের করুন সুর রাতের অন্ধকারকে নিংড়ে নিংড়ে নিঃশব্দে আঘাত করছে সনাতনের বুকের মাঝে।

"ওরে ও সনা তুই খাবি না" বৃদ্ধা মার গলা শোনা যায়। অদ্ভুত মানুষ তিনি। কত ঝড় ঝাপটা বহে গেছে তার জীবনের ওপর দিয়ে কিন্তু এতটুকু নুয়ে পড়েন নি তিনি। খাবার ইচ্ছে নেই সনাতনের। আজ তার মন থেকে উবে গেছে সকল কিছু। সাজানো গৃহের নোঙর আজ তার ছিঁড়ে গেছে···

তারপরের দিনগুলো যেন দিন নয় উত্তপ্ত আগুনের গোলা। কেবল উত্তাপ আর দাহ। ঝড়ের নদীর মত উত্তাল আর ভয়াল। কিন্তু অবশেষে আস্তানা হোল সনাতনের। সহরের এক কারখানার কুলীর কাজে, মন্দ জোয়ান সে। গতর খাটিয়ে উপায় করবে সে পয়সা।

এই কয়েকমাসের মধ্যে অনেক অভিজ্ঞতা বেড়েছে

সনাতনের। অনেক কিছুই শিখেছে সে···শিখেছে কালোবাজার···শিখেছে ইংরেজী, হিন্দী, অনেক বড় বড় শব্দ। আজ সে আর ইছাপুরের মূর্খ সনাতন দত্তী নয়···

সহরের জীবন অভ্যস্ত হয়ে গেছে বৃদ্ধা মোক্ষদার। আজ কাল তিনি একাই রেশনের দোকানে আসতে পারেন। কিন্তু তবুও মাঝে মাঝে তিনি অনুভব করেন, বাবলা বনের মাঝের সরু সিঁথির মত পথের হাতছানি। অনুভব করেন নারকেল গাছের সরু সরু পাতার ফাঁকে ফাঁকে লেপে থাকা সোনালী সূর্যের আলো। মাঝে মাঝে এই স্মৃতি আনমনা করে দেয় তাঁকে। যতই হ'ক কতদিনের বাস। মাঝে মাঝে তাঁর মনে পড়ে সেই দিনটির কথা...যে দিন তাঁর বিয়ে হল···ঘরে তুলবার সময় শাশুড়ী বলেছিলেন 'এতদিনে আমার ঘরে লক্ষ্মী এলো; আমার ঘর ভরে উঠবে শস্যে, অর্থে সকল কিছুতেই।' সত্যই ভরে উঠেছিল ঘর। জমি জমা, টাকাপয়সা কিছুরই অভাব ছিল না তাঁর। সহরের এই পঙ্কিল জীবনযাত্রায় মাঝে মাঝে বিষিয়ে ওঠে মন। ফিরে যেতে ইচ্ছে করে আবার সেই গাঁয়ে। যেখানে আছে মজে যাওয়া পুকুর...যেখানে ঝোড়ো হাওয়ায় গাছের মরা পাতাকে উড়িয়ে দিয়ে উঠান ভরে দেয়।

সত্যই অনেক কিছু ভাবতে শিখেছে সনাতন। সে আজ বুঝেছে কেন তাদের গ্রাম ছেড়ে আসতে বলেছিল চেয়ারম্যান সাহেব। কারণ সাহায্যের নাম করে মোটা টাকা তার ঘরে উঠবে। সে আজ বুঝতে পেরেছে যে তারাই হল ঐ সব অর্থলোভী মানুষের অর্থের বাটপারা। যখন তখন যেমন করেই হয় তাদের চড়িয়ে দিলেই হল। কোন সত্তা নেই, কোন প্রতিবাদ নেই। মরা দেশের মরা মানুষের দল। জীবনকে শুধু কল্পনাই করতে শিখেছে···শেখেনি তাকে রূপ দিতে।

বাইরে থেকে শোনা যায় বস্তীর রাম শেঠের গলা। "ও সনাতন ভাইয়া বাড়ী আছ।" পশ্চিমের লোক বানের টানে এদেশে এসে বাঙ্গলা শিখেছে। একই মিলে কাজ করে তারা। "এই যে সনাতন ভাইয়া, তুমি যে একদম ঘরের পোকা বনে গেছ, এতটুকু বাইরে বেরোও না। চলনা আজ সিধুর বাড়ী একটু গান বাজনার ব্যবস্থা আছে"...

অদ্ভুত আমোদ; বোতলের পর বোতল ধেনো, আর কুৎসিত গান। বস্তীর মতই নোংরা এদের আমোদ আহ্লাদ, এসব কিছুই ভাল লাগে না তার। সরল পথের সরল মানুষ সে। কিন্তু তবুও গেল সনাতন। আমন্ত্রণকে উপেক্ষা করতে শেখেনি সে।

পায়রার খুপরীর মত সারি সারি ছোট্ট ঘর। চারিদিকে নোংরা আবর্জনার গন্ধে আকাশ বাতাস ভারী। চারিপাশে ছড়িয়ে আছে দারিদ্র্যের উলঙ্গ রূপ।

আধো অন্ধকার ঘরের মধ্যে জড়ো হয়েছে সাত আটজন মানুষ। রোগা লিক্ লিকে সাত আটটা দেহ। তালি মেরে মেরে জীবন একদম পচে গেছে। তবুও এরা বাঁচতে চায়।

গুটিশুটি মেরে গোল হয়ে বসেছে তারা···মাঝে জ্বলছে ছোট একটা নিবু নিবু প্রদীপ। এই মানুষগুলোর জীবন শিখার মত নিবু নিবু তার শিখা। তেল ফুরিয়েছে, নিবল বলে। কোনের দিকে কাঁথায় শুয়ে যন্ত্রণায় কোঁকাচ্ছে সিধুর বৌ। অদ্ভুত জীবন যাত্রার প্রণালী!

ঢোল বাজিয়ে গান করছে সিধু কুৎসিত এক খেউড় গান। আর তারই সঙ্গে চলেছে গেলাসের পর গেলাস ধেনো। অশ্লীল আনন্দে এক একজন চীৎকার করে উঠছে মাঝে মাঝে, সনাতন আস্তে আস্তে টেনে নিল মাটির ভাঁড়টা। এক চুমুকে সাবাড় করে দিল সে। চন্ চন্ করে উঠল সনাতনের ঘুমন্ত রক্ত। শিরা থেকে উপশিরায় ছড়িয়ে পড়ল এক নতুন স্পন্দন। অদ্ভুত এক উন্মাদনা ঠিক যেমন হয়েছিল জমি নিয়ে দাঙ্গার সময়।

নেশা জমেছে সনাতনের, পাগলের মত নাচ্ছে সে।

নাচতে নাচতে মাঝে মাঝে টলে টলে পড়ে যাচ্ছে, আবার উঠে দাঁড়াচ্ছে। "এই শালা ঠিক্‌সে নাচো" "এঁ্যা কি বল্লি"···নেশা যেন ছুটে যায় সনাতনের। ফেলে দেওয়া মাটির ভাঁড়টা তুলে নিল সে। তারপর একবাড়ি তার মাথায়। ক্ষতস্থান দিয়ে ছুটে বেরিয়ে আসে লাল তাজা রক্ত।

আগুন ঝরা গ্রীষ্মের উত্তপ্ত দিনগুলোর মত বয়ে চলে সনাতনের দিনগুলো। বেলা শেষে আসে এক রাশ ক্লান্তি। বৈশাখী ঝড়ের সঙ্গে লুটপুটি করে যেমন ক্লান্তিতে লুটিয়ে পড়ে সুপরীর বন। এ কয়েক দিনে কাঠির মত হয়ে গেছে সনাতন। আজ কয়েকদিন থেকে মিলের মধ্যে ঘনিয়ে উঠেছে কালবৈশাখীর এক ঝোড়ো মেঘ।···

মাইনে বাড়াবার দাবীকে অগ্রাহ্য করেছে মিল মালিক। অবশেষে উঠল ঝড়। ধর্মঘট করল শ্রমিকরা। অবাক হয়ে গেল সনাতন তার বিশ বাইশ বছরের জীবনে এমন ব্যাপার সে কল্পনাও করেনি, চোখেও দেখেনি।

প্রথম প্রথম বড় ভালো লেগেছিল সনাতনের। কিন্তু দিন চলাই ভার হয়ে উঠল। দিন চলা বলতে দুবেলা দুমুঠো ভাত তাও জুটলো না সনাতনের।

তিন দিন উপোসের পর চতুর্থদিন সনাতন বেরুল পথে···যেমন করে হোক খাদ্য তাকে জোগাড় করতেই হবে। অন্ধকার সরু গলী পথ। বড় রাস্তার এক টুক্‌রো আলো ছিট্‌কে এসে পড়েছে। সেই আলোতেই পথ দেখতে পেল সে। এই নিস্তব্ধ অন্ধকার পথের মাঝে কোথায় পাবে সে জীবন আলো···বেঁচে থাকার পরোয়ানা। তার মনের মধ্যে চলে দ্বন্দ্ব। সত্য আর অসত্যের··· চিরদিনকার পুরনো দ্বন্দ্ব। একটি পথ ভিক্ষা···কিন্তু ভিক্ষা ত করতে পারবে না সনাতন···সতীশ মোড়লের ছেলে সে···ভিক্ষা সে করতে পারে না। অন্য একটি ভয়াবহ পথ···হিংস্র সে পথের নীতি···ভাবতে গিয়ে শিউরে ওঠে সনাতন।

কিন্তু বাঁচতে তাকে হবেই। মুহূর্তের এই ক্ষুধার দাবীকেও অগ্রাহ্য করতে পারে না সনাতন। ফিরে গেল সনাতন বাড়ীতে। চালের উপর থেকে নামিয়ে নিল দাটাকে। উত্তেজনায় হাত পা কাঁপছে। কপালের খাঁজে খাঁজে জমেছে দুই এক ফোঁটা ঘাম। হাত দুটো কাঁপছে ···তবুও···সনাতন বেরিয়ে আসে পথে।

গুনগুন করে গান গাইতে গাইতে আসছেন এক ভদ্রলোক ভাল জামা কাপড় পরা, উপযুক্ত শিকার। প্রথম দিনই ভাল শিকার মিলেছে সনাতনের। একটি মাত্র কোপের অপেক্ষা। ভয়ে বুকের ভিতরটা পাথর হয়ে গেছে। মাথাটা ঝিম্ ঝিম্ করছে, মনের মধ্যে গুমরে গুমরে উঠছে একটা কথা খাদ্য চাই···খাদ্য চাই বাঁচতে হবে তাকে। অতি সন্তর্পণে এগিয়ে যায় সনাতন। অনমনা ছিলেন ভদ্রলোক তাই বোধ হয় শুনতে পাননি সনাতনের ভীরু পদক্ষেপ। তারপরেই নেমে এল সনাতনের দা বিদ্যুত গতিতে। "মা গো" একটি মাত্র আওয়াজ তুলে চিরদিনের মত নীরব হয়ে গেলেন ভদ্রলোক। কিছুক্ষণ হতভম্বের মত দাঁড়িয়ে রইল সনাতন···তারপর তাড়াতাড়ি পকেটটা হাতড়াতে লাগল। একটা চামড়ার ভারী ব্যাগ···ছুটল সনাতন···

গলাটা শুকিয়ে কাট হয়ে গেছে। বাড়ীতে পা দিয়েই বসে পড়ল সনাতন, কেউ যদি তাকে দেখে থাকে। তবে···? নিশ্চয়ই···ফাঁসী। একটা পাকান গোল দড়ী। আর ভাবতে পারে না সনাতন···চোখের সামনে নেমে আসছে কালো অচেনা অন্ধকার।

বেড়ার ফাঁক দিয়ে মিঠে রোদের আলো এসে পড়ে ···সনাতনের মুখে। ধড়্‌মড়িয়ে উঠে বসে সে। চারিদিকে আলোয় ঝিক্ মিক্ করছে—যেন কতদিনের ঝড় বাদলার পর প্রথম সূর্যোদয়। আজ থেকে সনাতনের নতুন জীবনের সুরু···আজ থেকে সে বাঁচবে···কারণ সে পেয়েছে বেঁচে থাকার হাতিয়ার···দেখতে পেয়েছে বাঁচবার আলোকোজ্জ্বল পথ·····

সার্থকতা

শ্রীদীপঙ্কর দাশগুপ্ত
তৃতীয় বর্ষ (কলা)

সূর্য গেল ডুবে—
তার সাথে সাথে
জীবনের বৃন্ত হ'তে আর একটি দিন
ঝ'রে পড়ে গেল—কালের নীরব স্রোতে ভেসে গেল
বিস্মৃতির সাগরের দিকে।
জানি আমি—
একে একে ঝ'রে যাবে সব দিনগুলি
ফুটন্ত কুসুমের পাপ্‌ড়ির মতো
চৈত্রের দুরন্ত বাতাসে,
তারপর.....
পড়ে রবে তার রিক্ত বৃন্তখানি—
পড়ে রবে একান্ত অবহেলা ভরে :
ভ্রমর যাবেনা তার কাছে,
সম্ভাষণ জানাবে না কেউ,
শুধু তার নিঃস্বতার কথা
ক্ষণে ক্ষণে দোলা দিয়ে তাকে
জানাবে সবার কাছে দখিনা পবন।
আরো শেষে.....
ঝরে যাবে ব্যর্থতায় ভরা বৃন্তখানি—
মিশে যাবে ধূলায় ধূলায়—রবে না'কো কোন পরিচয়।
কিন্তু সেই বৃন্ত মাঝে যদি
দেখা দেয় ফলের উন্মেষ,
তবে সেই রিক্ততাই
পরিপূর্ণ হবে নব রূপে ;
খুঁজে পাওয়া যাবে এর প্রতি বীজে বীজে
জীবনের বৃন্ত হ'তে ঝ'রে যাওয়া
সব দিনগুলি।

———

"উঃ !"

অনীতা বিশ্বাস তৃতীয় বর্ষ (কলা)

উঃ! কি ঝামেলা বলুন তো? সামনে আমার প্রবেশিকা পরীক্ষা অথচ কেউ একবিন্দু সহানুভূতি জানাচ্ছে না। আপনারা হয়তো বলবেন ভারী তো প্রবেশিকা পরীক্ষা! কিন্তু আপনাদের পিছনে ফেলে আসা এই দিনগুলিকে স্মরণ করতে বলছি। সত্যিই কি উদ্বেগের মধ্য দিয়ে আপনাদের এই দিন ক'টি যায় নি?

ভোর বেলা উঠে মুখ ধুয়ে ইংরাজী কবিতার বইটা নিয়ে বসলাম, "Lucy" খুলে ভাবছি বেশ একটা ভাব টাব দিয়ে আবৃত্তি করা যাবে। চেয়ারের উপর পা তুলে বেশ ভাল করে বসে চেঁচিয়ে পড়তে লাগলাম—

"A violet by a mossy stone..

"ওলো অ' খেঁদু আজ ঝি আসেনি, বাসন কটা মেজে দিয়ে যানারে! আমি ততক্ষণ উনানে আগুন দিয়ে জলখাবার করি।" নীচে থেকে মা বলে উঠলেন।

আপনারাই বলুন মনের অবস্থা তখন কি রকম হয়! তবু উঠে এসে বসলাম বাসন মাজতে।

"অমনি মুখটা তোলা হাঁড়ি হয়ে গেল। রাতদিনই তো পড়ছিস। একটু ঘরের কাজ কর। এত বড় ধিঙ্গি মেয়ে লোকে বলবে কি? একটু লজ্জাও হয় না?"

অতিকষ্টে মুখে হাসি ফোটাবার চেষ্টা করলাম। বাসনমাজা শেষ হতে প্রায় এক ঘণ্টা লাগলো। মা বল্লেন—'যা কাপড়টা কেচে নিয়ে পড়গে যা।'

কাপড় কেচে সকলকে চা পরিবেশন করে, নিজে চা খেতে খেতে আরও এক ঘণ্টা কেটে গেল।

এবারে ইতিহাসটা নিয়ে বসলাম। বেশ মন বসেছে হঠাৎ ছোড়দা এসে বল্ল—"এই খেঁদু শার্টের বোতামটা লাগিয়ে দে ত। নে, তাড়াতাড়ি কর। ১০টায় কলেজ আছে।" "আমি পারবো না। দেখছো না পড়ছি, সকাল থেকে মাত্র একটা stanza পড়া হলো।"

"ওঃ! ভারী তো ম্যাট্রিক দিচ্ছেন। আমরা ঐ সময় হেসে খেলে বেড়িয়ে ছিলাম। তবু Ist divisionএ পাশ করেছি।"

কাজেই বোতামটা পরিয়ে দিতে হ'লো। তারপর আরম্ভ হ'ল বোনের স্কুল, দাদা আর বাবার অফিস যাওয়ার তাড়াহুড়ো। সুতরাং একটু সাহায্য করতে হ'লো।

নাঃ পড়ার সব mood গেল নষ্ট হয়ে। পাশের বাড়ীতে খুব জোরে রেডিও বেজে উঠেছে।

"কথা ক'য়ো নাকো, শুধু শোনো"। অতএব শুনতে হ'লো। মনকে বোঝালাম খেয়ে উঠে ভাল করে পড়বো।

ভাত খেয়ে আধঘণ্টা বিশ্রাম করে আবার পড়তে বসলাম। মা ততক্ষণে মাদুর পেতে দিবা নিদ্রার আয়োজন করছেন। আধঘণ্টা কেটে গেল ভূগোলটায় বেশ মন লেগেছে, হঠাৎ পিঠের উপর কার হাতের স্পর্শ পেলুম। চেয়ে দেখি ছোট বোন হাদু। "দিদি ভাই, কি সুন্দর ছবিরে? একটু দেখা না!"

বই এর দিকে চেয়ে দেখলাম রংচংএ ম্যাপের ছবিটি খোলা আছে। বল্লাম—"যাঃ যাঃ বিরক্ত করিস্ না। দেখছিস না পড়ছি?"

"উঁ, উঁ, বইটা একটু দেখি না।"

অগত্যা দিতে হ'ল।

"ওমা গো আরও কত ছবি!"

"দে বলছি! যা শীগ্‌গীর ঘুমোতে যা।" আদেশের সুরে বল্লাম।

"কেমন মজা দোবনা"।

ঠাস্ করে বসিয়ে দিলাম এক চড়। সঙ্গে সঙ্গে আমাদের হাদু কণ্ঠস্বর সপ্তমে চড়িয়ে মায়ের কর্ণে সুধা ঢেলে দিল।

"উঃ অতবড় মেয়েটা সব সময় ঝগড়া করছে। একটু যদি ঘুমোন যায়! এই হাদু আমার কাছে আয়।"

সর্ব্বনাশ! পাশের ঘরে মা জেগে উঠেছেন। আমিও রেগে গিয়ে বাংলা বইটা টেনে নিলাম। আজকে আর অপয়া ভূগোলটা পড়বো না। বিছানার উপর শুয়ে বইটা খুললাম—

জগতে সবাই আমার পিছনে লেগেছে। কেউ কি চক্ষে দেখতে পারে? এবার আমি ঠিক মরবো। তখন বুঝবে মজাটি সকলে। নাঃ, মরলে তো কে কি রকম কাঁদছে দেখা যাবে না। তার চেয়ে বরং কোথাও চলে যাব। বেশ মজা হবে, কাগজে কাগজে নিরুদ্দেশ বেরোবে। কিন্তু যাবো কোথায়—নাঃ কি আবোল তাবোল ভাবছি যে ছাই! নিয়মের রাজত্বে মন দিলাম। একটু একটু করে তন্দ্রা এল। ঝন্ ঝন্ ঝন্! চেয়ে দেখি হাদুর সঙ্গে ছোট ভাই কাঁদু এসে জুটেছে। আমার সুদৃশ্য চন্দন কাঠের বাক্সটি নিয়ে ঝগড়া করতে করতে ফেলে দিয়েছে। তারমধ্যে আমার কাঁচের চুড়ি ছিল। তারা পড়ে গিয়ে আর্ত্তনাদ করে উঠেছে।

উঃ কি যে করি। এবার সত্যি সত্যি কেঁদে ফেল্লাম মাও ততক্ষণে উঠে পড়েছেন। দুজনকে টানতে টানতে

আলোক-চিত্রশিল্পী : শ্রীঅশোক বন্দ্যোপাধ্যায় (১ম বর্ষ বিজ্ঞান)

আলোক-চিত্রশিল্পী : শ্রীজ্যোতিরিন্দ্র নাথ বক্সী (২য় বর্ষ বিজ্ঞান)

THE STUDENTS OF HISTORY IN AGRA

with Prof. Sukumar Bhattacharyya & Prof. Suresh Dey

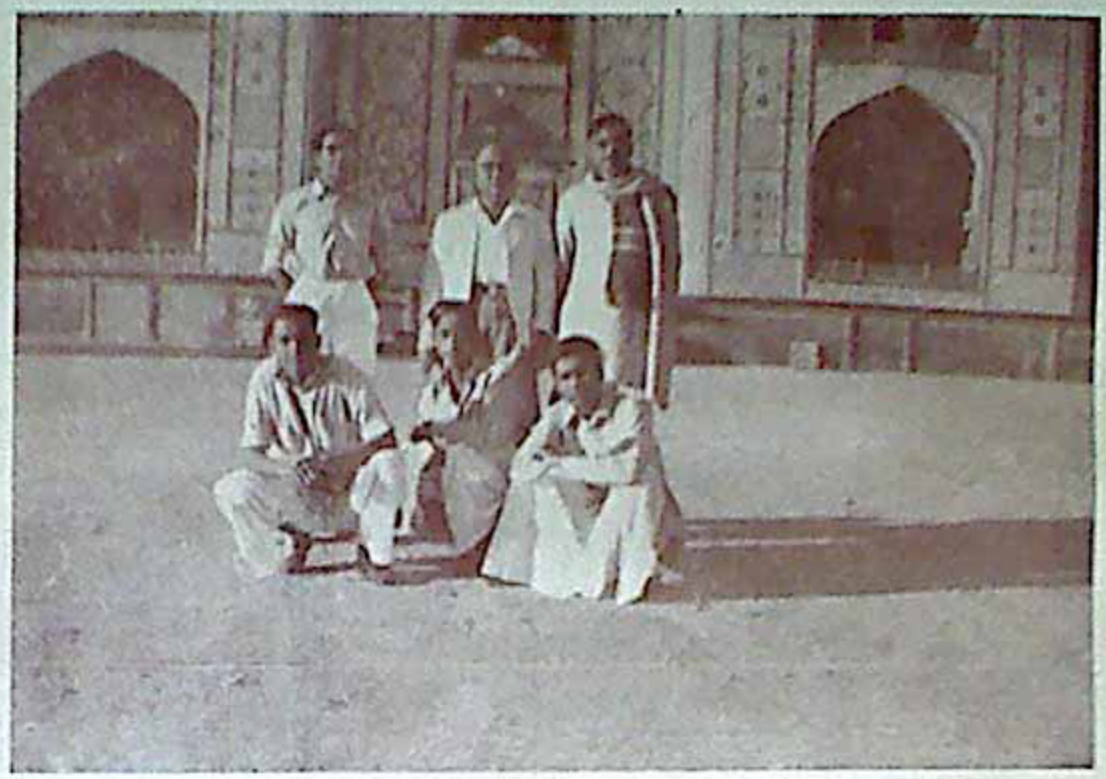

ANNUAL SPORTS (MORNING DEPARTMENT)

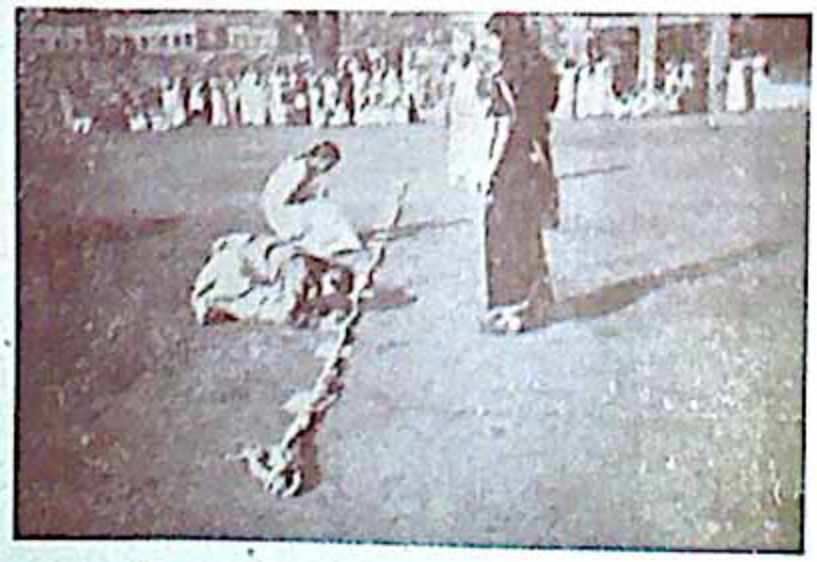

নিয়ে গেলেন তিনি। পড়াশোনা মাথায় উঠলো।

জলখাবার খাওয়ার পর একটু হাঁপ ছেড়ে বিক্ষিপ্ত মনটাকে স্থির করবার জন্য গান করতে বসলাম :

'নাইবা এলে সময় যদি নাই'

"ওমা গো, আমাদের খেঁদু বুঝি গান করতে শিখেছিস? বাঃ! আর একটা গান করতো শুনি"।

চেয়ে দেখি ও-পাড়ার বিন্দুপিসী পিছনে এসে দাঁড়িয়েছেন। তাঁর মুখে প্রশংসা শুনে আনন্দে উচ্ছ্বসিত হয়ে গান ধরলাম—"মা—ধু—ব"।

"হ্যাঁরে! তোর মেজদাকে দেখছি না তো?" পিসী প্রশ্ন করলে।

ডাকলাম—"ও মেজদা! পিসী ডাকছেন।"

"থাক থাক, তুমি গান কর।"

গেয়ে চল্লাম

"দেহি তুলসী তিল এ দেহ সমর্পলু"...

হঠাৎ মনে হ'লো কেউ তো আমার গান শুনছে না? চেয়ে দেখি বিন্দু পিসী মেজদাকে বলছেন :

"...খাঁদুটা যা দুষ্টু হয়েছে..." গান থামিয়ে ফেল্লাম। নাঃ, এইবার strike করবো। মেজদার এইবার আমার দিকে দৃষ্টি পড়লো।

"কিরে! আজ বাদে কাল পরীক্ষা, এখনো গান করছিস? যা পড়গে যা।"

পিসী বল্লেন, "আহা আমি বলেছি।"

আমি ততক্ষণে পড়ার ঘরে ছুটলাম। বসে বসে পূর্ব্ব ঘটনার সমালোচনা করতে লাগলাম। আবার বার করলাম 'Lucy'। দু-তিনটে Stanza পড়েছি এমন সময় পিসী এসে বল্লেন, "চল্লাম খেঁদু"। মনে মনে বল্লাম 'গেলেই মঙ্গল'। মুখে বল্লাম—"এত তাড়াতাড়ি?" "তা যখন তুই বলছিস তখন একটু বসেই যাই।" আবার গল্পে গল্পে একঘণ্টা কাটলো। আমি ক্রমশঃ উসখুস করতে লাগলাম। এইবার তাঁর নজর পড়লো। "যাই ভাই, নাত্‌নীটা আবার কাঁদবে।" এবার আর কিছু বল্লাম না।

তারপরেই এলেন মাষ্টার মশাই—"কিছু পড়া হয়নি? এরকম করলে চলবে না। তোমার বাবাকে বলে দেব।" অকারণে হাতটা চুলকান ছাড়া আর কোন উপায় খুঁজে পেলাম না। ভাত খেয়ে আবার পড়তে চেষ্টা করলাম। সবাই শুয়ে পড়লো। আধঘণ্টা পরে বাবার স্বর শুনতে পেলাম। "অসুখ করবে যে খাঁদু, রাত জাগিসনি, শুয়ে পড়।" পাশ থেকে ছোড়দা বলে উঠলো—"ভারী তো পড়ছে! খালি ঢুলছে। মিছামিছি ইলেক্‌ট্রিকের বিল ওঠাচ্ছে। আমরাও ম্যাট্রিক্ দিয়েছি।"

উঃ, এবার অসহ্য হয়ে উঠলো। কাঁদতে কাঁদতে বিছানায় গিয়ে শুলাম।

তৃতীয় বিভাগে পাশ করলাম। বাবা বল্লেন—"এরকম আশা করিনি।' ছোড়দা বল্ল—'আমরাও অনেক কাজ করেছি কিন্তু তা' বলে কখনও 3rd divisionএ পাশ করিনি।' মেজদা বলল—"সারাদিন গান করবে না পড়বে?" মা বল্লেন—"শুধু পড়াশুনা করেই যদি এই হয়, কাজ কর্ম্ম করলে না জানি কি হোত!"

অবস্থা দেখে খাঁদু ভাবলো একটা কিছু দোষ করেছি তাই সেও বলে উঠলো "দিদি ভাই আমাকে মেরেছিল!"

———

অমৃতস্য পুত্রাঃ

শ্রীমহামায়া মিত্র—তৃতীয় বর্ষ (কলা)

আহত যৌবন-স্বপ্ন বাস্তবেরি ঘায়
বারে বারে। তবু হায় কামনার ফুল
বিশ্বাসের বৃন্তপরে ফুটিবারে চায়,
দুরাশা আশারে চেয়ে রচে শুধু ভুল।
দিগন্তে পাণ্ডুর চাঁদ মৃত নীহারিকা
দুঃস্বপ্ন ঘনায় মনে। প্রাণের স্পন্দন
থেকে থেকে রুদ্ধ হয়; তবু চিত্তশিখা
ঊর্দ্ধমুখে যেতে চায়। করে সে ক্রন্দন
ব্যর্থতার কশাঘাতে। তবু রাত্রিদিন
উত্তুঙ্গ আদর্শ স্বর্গে যাইবার লাগি,
ক্ষীণ দুটী বাহু তুলি—বিরাম বিহীন
দুঃসাধ্য সাধন করে অহোরাত্র জাগি।
মানবে জর্জ্জর করে আঘাত অযুত
মানেনা সে হার, সে যে অমৃতের সুত।

জলের নেশা

শ্রীইলা সেনগুপ্তা—প্রথম বর্ষ (কলা)

কালির ভৈরবী মূর্ত্তি অকস্মাৎ শান্ত শ্যামলিমা পরিপূর্ণ হয়ে উঠেছে। অন্তরের এ শ্যামল ছবি তার উভয় তীরকে করেছে প্রাণরসে ভরপুর, নবজীবনের সুরাস্পর্শে যেন অকস্মাৎ ভোলা শিবের বক্ষে নৃত্যমত্ত পাগলী মেয়ে লজ্জিত হৃদয়ে ভ্রম সংশোধনের প্রয়াস পাচ্ছে। তাই সেখানে বইত স্মরণের বুকে মরণের লীলা যেখানে আজ মৃত্যুর ইতিহাস ব্যর্থ করে জেগে উঠেছে তারুণ্যের স্ফূর্ত্তি। শশ্মান বিহারের পরিবর্ত্তে বাসর যাপন। তাই বোধ করি কালির প্রচণ্ড গর্জ্জনের পরিবর্ত্তে শোনা যাচ্ছে গঙ্গার কুলুকুলু ধ্বনি। ঠিক যেন প্রেমিকের হৃদয়ের প্রথম সানাইয়ের রেশ। তাই জীবন-মরণের সন্ধির ফলে এর নাম হয়েছে কালিগঙ্গা।

তবু জীবনের রূপ যতই সুন্দর হউক না কেন মরণের তুলনা নেই। জীবন ক্ষণিকের। মরণ শাশ্বত কালের। সত্য বলেই সে সার্থক সুন্দর। তাই দিবানিশি স্বপ্ন দেখে বুড়ো মাঝি—ঐ যেখানে দুষ্টু মেয়ে উচ্ছৃঙ্খলতার বেলায় ধ্যানমগ্ন উদাসীন যোগীর বিশাল জটাভারের বন্ধীত্ব এড়িয়ে চুপি চুপি বেরিয়ে পরে কালির বুকে চুমা দিয়ে শোনাচ্ছে ভাঙ্গনের গান। সেখানে কালির বুকে ঢেউ-গুলি উঠ্‌ছে পড়ছে, গর্জ্জাচ্ছে ফুলছে। ক্রুদ্ধ নাগিনীর মতো বিষের ধোঁয়ায় দিগ্‌বিদিক্ আচ্ছন্ন করে ফেলতে চাইছে। সেখানে সর্ব্বনাশা মেয়ে দুহাত মেলে ডাকছে "মৃত্যু তাণ্ডবে যোগ দিবি কে অশান্ত আয়।" সে ডাক গিয়ে পৌছায় শিরায় শিরায় প্রতিরক্ত কণায় বিজলীর তীব্র জ্বালার মতো।

সে ডাকে দোলা লাগে কিশোর রঙ্গণের ভাব বিহ্বল অন্তরের মাঝটিতে: ঐ যেখানে আকাশ ধরা দিয়েছে অথৈ জলের বুকে। যেখানে হঠাৎ কালিকে জড়িয়ে ধরে

কীর্ত্তিনাশা আবার পালিয়ে যাচ্ছে খিলখিলিয়ে হেসে। সেখানটিতে পালিয়ে যাবে কি রঙ্গণ? মৃত্যুর সঙ্গে লড়তে চায় ওর ভিতরের কৌতূহলী শিশু, জানতে চায় কোন মাণিক লুকানো আছে ঐ অতলে। পাতাল পুরীর পথের সুরু কি ওখানে?

কালির বুকের প্রথম শ্রাবণ ধারার মত জল ঝরছে রঙ্গণ মাঝির ছানি-পড়া চ'খে। কীর্ত্তিনাশার যোগ্যসঙ্গী কালির নামের সঙ্গে গঙ্গার নাম সইতে পারছে না ও। সেবার যখন শোনা গেল কালির অফুরন্ত ভালবাসা উপেক্ষা করে পদ্মা সরে গেছে দূরে, ভীত ত্রস্ত গ্রামবাসী সবিস্ময়ে দেখলে নতুন করে গড়ে উঠেছে তাদের ক্ষুদ্র গ্রামখানি। যেন প্লাবনের পরে স্রষ্টার আশীর্ব্বাদে চির পুরাতন ধরণীর নূতন রূপে আবির্ভাব। তবু এ রূপ তারা চায়নি। জলের ধারে বাস যাদের, জলই তাদের আপনার। শ্যামলা ধরিত্রীর স্নেহ আলিঙ্গন নয়, কিন্তু তবু সয়ে যায়। শুধু ভুলতে পারে না রঙ্গণ মাঝি। ঘুমন্ত স্ত্রীর বুক থেকে একমাত্র শিশু পুত্রকে তুলে নিয়ে বিসর্জ্জন দিয়েছে ও রাক্ষসী পদ্মার গর্ভে। তবু না ফিরল ছেলে, না ফিরল সর্ব্বনাশী।

লোকে বলে বুড়ো মাঝি পাগল হয়ে গিয়েছে। কিন্তু মাঝি জানে ওর রক্তে পাগলামোর বীজ নেই। আছে ভাঙ্গনের নেশা।

হঠাৎ একদিন গ্রামবাসী সবিস্ময়ে দেখল পূর্ব্বরাগের স্মৃতি বহন করে পদ্মার বুক থেকে পৈতার মত সরু এক রক্তের ধারা ভিন্ন পথে মিশেছে কালির বুকে। তবে বুঝি দূরে সরে যাওয়া শুধু মাত্র ছলনা···

ঋষি দেবীর গভীর স্নেহ-নীড়ে আশ্রয় নিয়েছে ক্ষুদ্র গ্রামখানি। তারকাখচিত কৃষ্ণ পোশাকে অমাবস্যার নিষ্ঠুর রাত্রি কালির বুকে হারিয়ে-যাওয়া চাঁদের খোঁজে ফিরছে। এমন সময় ও কিসের গান জেগে উঠেছে কালির বাঁকা স্রোতে? হারাণো প্রেমের দিনগুলি কি আবার এসেছে ফিরে? পুরোণো যৌবন ফিরে পেয়েছে যেন। ততদিন যেন কোন দুঃস্বপ্নে কেটেছে ওর রাত্রি।

ছোট্ট ডিঙ্গিখানি নিয়ে বেরিয়ে পড়েছে সে দিনের কিশোর রঙ্গন। ক্ষুধিত নাগিনী বাহু মেলে গ্রাস করছে ক্ষুদ্র গ্রামটিকে। ঢেউগুলির প্রচণ্ড গর্জ্জনে আতঙ্ক-বিহ্বল গ্রামবাসীর কণ্ঠস্বর ধীরে ধীরে গেল মিলিয়ে। বহু দিনের অভিমান ভুলে দুই সখী আবার অজস্র চুম্বনে ভরে দিচ্ছে দুজনকে। পাতালপুরীর পথে চলেছে কিশোর রঙ্গন ঘুমন্ত রাজকন্যার সন্ধানে।

রবীন্দ্রনাথ

জয়শ্রী চৌধুরী—তৃতীয় বর্ষ (কলা)

তোমার বাণীর মাঝে অজস্র সান্ত্বনা
ধ্বনিতেছে অহরহ, বিশ্বের ব্যঞ্জনা
তার সাথে বিজড়িত রহে
যখন প্রত্যহ আসে ছোট দুঃখ বহে'
তখন তোমার বাণীখানি
মুক্তির নৈবেদ্য বহি' আনি
আমার অঙ্গনে দেয় হাঁক
ক্ষুদ্র দীনতার জালা করে পরিপাক।

তোমার মধুর কাব্য প্রাত্যহিক দুঃখে খঞ্জ হানে
আমার অন্তর তারে শান্তির অদেখা দূত জানে
দিক হতে' দিগন্তের ভালে
রাত্রির কপালে
যখন ধ্বনিত হয় জ্বালাময় নিঃশব্দ ক্রন্দন
তখন তোমার কাব্যধন
আমার মনের বনে জাগায় অজস্র সমারোহ
দূর করে যে দুঃখ দুঃসহ।

বঙ্কিমচন্দ্র

শ্রীপারুল সরকার—তৃতীয় বর্ষ (কলা)

আমাদের শাস্ত্রে আছে যে মানুষ-সাধনার বলে ব্রহ্মপদলাভের অধিকারী হইতে পারে কিন্তু সে মানুষ দেহধারী আত্মা। দেহবদ্ধজীবরূপে তাহার যে সত্তা, মনুষ্যজীবন বলিতে ইন্দ্রিয়াধীন যে জীবন ও প্রবৃত্তির দ্বন্দ্ব বুঝায় তাহার যে পৃথক গৌরব আছে, একথা ভারতীয় শাস্ত্রে স্বীকৃত হয় নাই। কিন্তু এই "মনুষ্য জীবনের যে রহস্য তাহার অন্ত নাই—মানুষের প্রাণমন ও মানুষের হৃদয় বিরাট ও অতল স্পর্শ—মানুষের জীবনে যে শ্রী ও শক্তিবিকাশের অসীম সম্ভাবনা আছে তাহার দেহে যে ভোগের শক্তি মনে যে সৃজনীশক্তি ও প্রভুশক্তি আছে, হৃদয়ে যে প্রেমের ও ত্যাগের শক্তি আছে তাহার পূর্ণতা সাধনই মানবজীবনের চরমলক্ষ্য।" (মোহিতলাল)। এই যে মানবধর্ম্মবাদ ইউরোপ হইতে আসিয়া বাঙ্গালী সমাজে প্রবেশ করিল, রামমোহনই প্রথম এই মন্ত্রে উদ্বুদ্ধ করিলেন বাঙ্গালী। বিদ্যাসাগরের জীবনে এই মন্ত্র আরও পূর্ণরূপে প্রকাশিত হইয়াছিল। সমাজ-সংস্কার শিক্ষা-বিস্তার, ভাষা ও সাহিত্যের পথনির্ম্মাণ—এই সকল প্রচেষ্টার মূলে ছিল মানুষের ও মনুষ্যত্বের উদ্বোধন। ইহার অনতিকাল পরে এই চিন্তা সাহিত্যের মধ্য দিয়া প্রবাহিত হইল মধুসূদনের কাব্য। নব মানবধর্ম্ম কবি-প্রাণের গভীর আকুতিরূপে কাব্যের মধ্যে রাণী হইয়া উঠিল। মাইকেলের মেঘনাদ বধ কাব্যই ইহার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ নিদর্শন। রাবণ এই কাব্যের পূর্ণ মানবের জীবন্ত প্রতীক—মেঘনাদও মানবতার আদর্শে মহীয়ান। মধুসূদন যে পয়ারছন্দ ভাঙিয়া নূতন ছন্দ গঠন করিলেন তাহাতে তাঁহার প্রবল আত্মঘোষণার সুরই বাজিয়া উঠিয়াছে,—এই আত্ম-ঘোষণার সুর রাবণের চরিত্রে মূর্ত্তি পাইয়াছে। মেঘনাদের চরিত্রে মানুষের যৌবনশক্তি ও তাহার যতকিছু মহিমা দেবশক্তির ও দেবভক্তির অনেক উর্দ্ধে উঠিয়াছে।

এতক্ষণ পর্য্যন্ত আমরা দেখিলাম ব্যক্তি চেতনা ও মানবতার জয়গান বাঙ্গালীর প্রাণমূলে বাসা বাঁধিয়াছে। কিন্তু মধুসূদনের কাব্যে ইহা শুধুই প্রাণের অদম্য আবেগরূপে প্রবাহিত হইয়াছে। ইহাতে কোনো সমস্যা নাই, কোনো দ্বন্দ্ব নাই। বঙ্কিমচন্দ্রের মধ্যে ইহা অসামান্য হইয়া দেখা দিল। তাঁহার মধ্যে ইহা সমস্যার অবতারণা করিল। একদিকে সমাজ চেতনা ও অপরদিকে ব্যক্তি চেতনা: ইহার মধ্যে কোনটি বর্জনীয় কোনটি গ্রহণীয় তাহা লইয়া—দেশের নেতৃস্থানীয়গণ অত্যন্ত বিব্রত হইয়া পড়িলেন। ইহার ফলে ব্যক্তি চেতনারই জয় ঘোষিত হইল এবং জনসাধারণ ইহার মোহে যাহা কিছু পুরাতন তাহাকেই বর্জন করিতে লাগিলেন। কিন্তু বঙ্কিম তাঁহার অলোকসামান্য প্রতিভাবলে এই দুই বিরোধের মধ্যে সামঞ্জস্য স্থাপন করিলেন। যে ভাব বা idea মানুষকে বিব্রত করিয়াছিল বঙ্কিম তাঁহার সাহিত্যের দুই ধারায়—উপন্যাস এবং প্রবন্ধে তাহার সমাধান করিলেন। তিনি ব্যক্তি-স্বাধীনতাকে ও মানবধর্ম্মকে সমাজচেতনার দ্বারা শোধন করাইয়া লইলেন। কথাটা একটু বুঝাইয়া বলা যাক। বঙ্কিম 'সমাজ' বলিতে কি বুঝিতেন? তাঁহার নিকট সমাজ সীমাবদ্ধকালে কতকগুলি নির্দ্দিষ্ট মানুষের রচিত আচার অনুষ্ঠানই নহে।—সমাজ অর্থে তিনি বুঝিতেন প্রত্যেক মানুষের অন্তরের ঘনিষ্ট যোগ। এই যোগ অদৃশ্য অথচ বিশাল। সরোবরে যেমন লোষ্ট্র নিক্ষেপ করিলে তরঙ্গের পর তরঙ্গ উঠিয়া তাহা বহু দূর প্রসারিত হয় তেমনি কোনো মানুষ যখনই কোনো কর্ম্ম করে তাহার তরঙ্গও তেমনি এক মানবহৃদয় হইতে অপর মানবহৃদয়ে প্রসারিত হয়, সেই তরঙ্গে যে কে কোথায় কক্ষচ্যুত হইবে, তাহা বলা যায় না। আবার ব্যক্তি-জীবনেও মানুষের পূর্ণ মানবতার আদর্শ কি? ইহাতে তিনি বুঝিতেন পূর্ণ মনুষ্যত্বের উদ্বোধন। পূর্ণ মনুষ্যত্ব লাভ করিতে হইলে জীবনকে কামনাবাসনার অতীত করিয়া আধ্যাত্মিক পথে চালিত করা তাহার উদ্দেশ্য নহে। মানবকে তাহার চিত্তরঞ্জনী ও জ্ঞানার্জ্জনী—এই দুই বৃত্তির অনুশীলন করিয়া অর্থাৎ জীবনকে ভোগ করিয়া তাহার আশাআকাঙ্খাই পূর্ণ করিবার চেষ্টা তাহাই মনুষ্যধর্ম্ম। কিন্তু মনুষ্যজীবনের উদ্দেশ্য সুখ—শুধু ভোগ নহে। শুধু ভোগেই জীবনকে সীমাবদ্ধ করিয়া রাখিলে মনুষ্যত্বের উদ্বোধন হইবে না; কিন্তু ভোগেই তো সুখ পাওয়া যায়! তবে বঙ্কিম সুখ বলিতে কি বুঝিতেন?—বঙ্কিম সুখ বলিতে "স্থায়ী সুখ" বুঝিতেন।

জীবনকে শুধু চিত্তরঞ্জনী বৃত্তির অধীন করিয়া রাখিলে যে প্রমত্ত ভোগের আস্বাদন—তাহাতে সুখ আছে বটে, কিন্তু তাহাতে অবসাদও আছে। তাহাতে উদারতার কোনো মহৎ সুখ নাই। এই সুখকে জ্ঞানার্জ্জন বৃত্তির দ্বারা বৈজ্ঞানিক বুদ্ধির দ্বারা শোধন করিয়া লইলে তবেই তাহা স্থায়ী সুখ হইবে। এই জ্ঞানার্জ্জনী বৃত্তি অর্থে সংযম। রোগী কুপথ্য করিয়াই সুখী। কিন্তু জ্ঞানার্জ্জনী বৃত্তি দ্বারা সে সুখকে যাচাই করিলে তাহার আপাত মিষ্টতা অতিক্রম করিয়া তাহার বহু দূর-প্রসারী অপকারিতা দৃষ্ট হইবে। তখনি জাগিবে সংযম। এই সংযমও ইন্দ্রিয়ভোগ এই দুয়ের সামঞ্জস্যে যে ভোগ তাহাই প্রকৃত জীবনভোগ ও তাহাই প্রকৃত সুখ। যখন জীবনে এই সুখের আবির্ভাব হয় মানুষ তখনই প্রকৃত সুখী এবং তাহাতেই মনুষ্যত্বের পূর্ণ উদ্বোধন। ব্যক্তি স্বাধীনতার ও পূর্ণ মানবত্বের এই যে সংজ্ঞা ইহা সমাজচেতনার প্রতিকূল নহে, পরন্তু ইহা অনুকূল। সমাজ-চেতনার সমাজের অর্থাৎ ব্যষ্টির কল্যাণে সাধনই একমাত্র লক্ষ্য এবং সেখানেও মূল কথা সংযম।

বঙ্কিমচন্দ্রের ব্যক্তিস্বাধীনতার মূল কথা সংযম। সুতরাং দেখা যাইতেছে এই দুইয়ে কোনো বিরোধ নাই। এই যে জীবন-দর্শন ইহা বঙ্কিমের সামাজিক উপন্যাসগুলিতে সুন্দরভাবে প্রকাশিত হইয়াছে। নগেন্দ্রনাথ স্বাধীন, আত্মসুখের জন্য তিনি যাহা ইচ্ছা করিতে পারেন—কিন্তু এই স্বেচ্ছাচারিতা মানুষের ধর্ম্ম নহে। তিনি আপন সুখের জন্য যাহা করিলেন তাহাতে সূর্য্যমুখী ও কুন্দ কক্ষচ্যুত উল্কার ন্যায় কোথায় ছিট্‌কাইয়া পড়িলেন।

নগেন্দ্রনাথও দেখিলেন ইহাতে আপাত সুখ আছে, স্থায়ী সুখ নাই। কিন্তু তথাপি নিয়তির গতি রুদ্ধ করিবার সাধ্য তাঁহার নাই। বিধবা-বিবাহ অথবা বিধবার প্রেম ভাল, কি মন্দ, অথবা পুরুষ একাধিক বিবাহ করিতে পারে কিনা ইহা 'বিষবৃক্ষের' মূলকথা নহে। মূলকথা মানুষের জীবনের দুর্ব্বার কামনা মানুষকে দগ্ধ করে—মানুষ সেই কামনার বিষে জর্জ্জরিত হইয়া যাহা ভোগ করে জীবনে যাহা হয় তাহা এই—ইহাই জীবনের পরিণতি। ইহাতে কোন নীতি কথা নাই। বঙ্কিম জীবনকে পূর্ণরূপে দেখিয়াছিলেন। নগেন্দ্রনাথ একদিনও যদি কুন্দকে লইয়া সুখী হইয়া থাকেন তাহার চিত্র দিয়াই তিনি উপন্যাসটিকে শেষ করিতে পারিতেন। কিন্তু তাহা হইলে জীবনকে খণ্ডরূপে দেখা হইত। কারণ জীবনের শেষ ত সেখানে নয়। তাহা করিলে এই উপন্যাস হয়ত good art হইত, কিন্তু great art হইত না। অথবা নগেন্দ্রনাথ যদি কুন্দকে বিবাহ না করিতেন, কর্ত্তব্যবুদ্ধি যদি তাঁহাকে নিষেধ করিত, তাহা হইলেই কি তিনি সুখী হইতেন? এ প্রশ্নের উত্তরে বলা যায় তিনি সুখী হইতেন না। কিন্তু সেখানে যে দ্বন্দ্ব হইত তাহা তাঁহার অন্তরেই সীমাবদ্ধ থাকিলেও সূর্যমুখীকে তাহা স্পর্শ করিত এবং কুন্দনন্দিনীকেও তাহা স্পর্শ করিত অপরোক্ষ ভাবে। তাহার পরিণতি আর যাহা হউক—সুখের হইত না। নগেন্দ্রনাথ, সূর্যমুখী বা কুন্দ কাহারও জীবনে সংযম ছিল না। সুতরাং পূর্ণ মনুষ্যত্বের আদর্শ কাহারও জীবনে ছিল না। কাজেই সমস্যা একই থাকিত। বঙ্কিম 'বিষবৃক্ষে' মানুষের বৃহত্তর জীবন কি, তাহার আভাস-মাত্র দিয়াছেন এবং জীবনের যাহা পরিণতি তাহাই দেখাইয়াছেন। তিনি humanityর জয়গান গাহিয়াছেন বটে কিন্তু তাহাতে উচ্ছৃঙ্খলতার প্রশ্রয় নাই। মানুষের আশা আকাঙ্ক্ষাকে তিনি গভীর সহানুভূতির সহিত চিত্রিত করিয়াছেন। আবার তাহার পরিণামও দেখাইয়াছেন। 'চন্দ্রশেখরের' প্রতাপ পূর্ণ মনুষ্যত্বের প্রতীক। তিনি ভালবাসিয়াই সুখী। তাঁহার ভালবাসায় সংযম আছে। তাঁহার আশা-আকাঙ্ক্ষা শৈবলিনীর মঙ্গল সাধন করা। সেই আকাঙ্ক্ষায় তিনি প্রাণ বিসর্জন করিয়াছেন—ইহাতে তাঁহার মৃত্যু মহত্তর হইয়া উঠিয়াছে। তাঁহার মৃত্যুতে যত বড় tragedy-র সৃষ্টি হউক না কেন, তথাপি এই আশ্বাস আছে যে, তিনি জীবনযুদ্ধে জয়লাভ করিয়াছেন। এখন প্রশ্ন হইতে পারে তিনি ত জীবনে এমন কোনো কাজ করেন নাই যাহাতে তাঁহার এই tragic মৃত্যু হইতে পারে। ইহার উত্তর এই যে, জীবনে নিয়তির লিখনে মানুষের এইরূপই হয়। উপরন্তু একথাও বলা যায় যে, তিনি জীবনযুদ্ধে যেমন জয়ী হইয়াছিলেন তেমনই মৃত্যুকেও বরণ করিয়া জয় করিয়া লইলেন। ইহাতে মানুষের জীবনই বড় হইয়াছে, নিয়তি নহে। 'কৃষ্ণকান্তের উইলে'র গোবিন্দ-লালও তাঁহার জীবনের দ্বন্দ্বে ভাসিয়া কোথায় চলিয়া গেলেন। তাঁহার আশা, আকাঙ্ক্ষা, তাঁহার প্রাণের অদম্য আবেগ তাঁহাকে স্থির থাকিতে দেয় নাই। অবশেষে সকল কিছুরই যেমন শেষ আছে, তাঁহার জীবনেও তেমনি উপসংহার আসিল। সেই উপসংহারে তিনি জয়লাভ করিলেন। তাঁহার প্রবৃত্তির দ্বন্দ্ব অন্তরেই তখন প্রশমিত হইয়া প্রশান্তি লাভ করিয়াছে। হৃতসর্বস্ব হইয়াও তিনি হৃদয়ে অনির্বচনীয় শান্তি লাভ করিয়াছেন। নিয়তির উপরেও তিনি জয়লাভ করিয়াছেন। দুঃখের আগুনে পুড়িয়া তিনি খাঁটি সোনাই হইয়াছিলেন। এই যে জীবন দর্শন ইহা যে কত বড় অধ্যাত্ম দৃষ্টির ও কবি-কল্পনার পরিণাম তাহা ভাবিয়া দেখিলে বাস্তবিক আমাদের বিচারবুদ্ধি স্তম্ভিত ও মূক হইয়া যায়। বঙ্কিমচন্দ্র জীবনের এই যে সমস্যা ও কাহিনীকে অঙ্কিত করিয়াছেন ইহা চিরকালের মানবের সমস্যা; এবং ইহা শুধু বাঙ্গালীর নহে, পৃথিবীর মানুষের সমস্যা ও কাহিনী। সকল যুগে সকল কালের মানুষের মনে ইহার দাবী থাকিবে। এই দিক দিয়া বিচার করিলে একদিকে তিনি যেমন সমস্ত যুগ-প্রবৃত্তিকে তাঁহার কাব্যে স্থান দিয়া যুগনায়করূপে দেখা দিয়াছেন, অন্য দিকে এই নবলব্ধ humanity-র আদর্শকে নানারূপ ভাবে রহস্যময় ইঙ্গিতে ব্যঞ্জনায় চিত্রিত করিয়া জীবনের যে রহস্য-মধুর চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন, তাহাতে তিনি রোমান্টিকরূপেও আবির্ভূত হইয়াছেন।

জীবন দেবতা

শ্রীঅজিতকুমার সরকার—প্রথম বর্ষ (বিজ্ঞান)

জীবনের পরপার হ'তে
মরণের সিংহদ্বার দিয়া
স্মিত-স্নিগ্ধ মুগ্ধ মুখে
গাঢ় প্রীতিভরা বুকে
মোর জন্ম মরণের মাঝে
কে তুমি নির্ব্বাক দাঁড়াইয়া ?
জীবনের দিকচক্র সীমা
লভে নাই অপূর্ব মহিমা
পরিপূর্ণ সার্থকতা আজও
পায় নাই আমার এ হিয়া
তবে কেন জীবনের মাঝে
দাঁড়ায়েছ গাঢ় প্রীতি নিয়া !

মৃত্যুর নিভৃত স্নিগ্ধ ঘরে
তুমি মোর করিবে মঙ্গল ?
অসম্পূর্ণ জীবনের কাজ
এই নর জগতের মাঝ
অমর অমৃত স্পর্শ দিয়া
চিরতরে করিবে উজ্জ্বল ?
জীবনের অসমাপ্ত কথা
শেষ ক'রে দেবে তুমি হেথা
হৃদয়ের যতেক বেদনা
তব প্রেমে করিবে কোমল ?
অন্তহীন এ জীবন মোর
মৃত্যু দিয়া করিবে সফল ?

ওহে মোর জীবন দেবতা
দিবে মোরে কোন সার্থকতা ?
মোর দ্বারা কি মহৎ কাজ
করিয়া লইবে তুমি আজ
কোন কর্ম্ম সাধিবার তরে
দাঁড়ায়েছ আসি তুমি হেথা ?
নিয়ে যাবে কোথা মোরে
কোন সাগরের তীরে
আমার জীবন তাহে
কতটুকু পাবে সফলতা
কর্ম শেষে এ জগতে
কতটুকু রবে কীর্তিগাথা ?

আমার অন্তর মাঝে যত
মূক আশা আছে ভরপুর ;
বিসর্জন দিতে পারি তবে
চিরকাল স্মৃতি যার রবে
চির বিস্মৃতির মাঝে যাহা
সর্ব প্রাণে ক্ষরিবে মধুর !
পশ্চাতে রাখিবে নব স্মৃতি
চিরকাল গেয়ে যাবে গীতি
অন্তহীন এই বিশ্বমাঝে
তুলিবে সে নব নব সুর
চিরকাল থাক যদি সাথে
যেতে পারি আমি বহুদূর।

—

পল্লী-উন্নয়ন

রেখা কাঁড়ার—প্রথম বর্ষ (কলা)

"ভারতে রোগের প্রকোপ যেরূপ বেশী এবং এদেশে লোকের গড় মৃত্যু সংখ্যা যেরূপ অধিক তাহাতে স্বাস্থ্য ও জীবন যাত্রার দিক দিয়া এদেশ-বাসীর চরম অধঃপতিত অবস্থাই প্রমাণিত হয়। ব্যাপক স্বাস্থ্যহীনতা ও দুঃখ গ্লানির এইরূপ শোচনীয় চিত্র বর্ত্তমান যুগে আর কোথাও বড় একটা লক্ষিত হয় না।" পল্লী সমাজ বাঙ্গালীর সভ্যতা সাধনার কেন্দ্রস্থল। কেন্দ্রস্থল ব্যাধিদুষ্ট হওয়ায় পল্লীসন্তানদের রূপ, রস, প্রাণ অকালেই শুকাইয়া যায়। স্বাস্থ্যহীনতা, চিকিৎসার অব্যবস্থা, দারিদ্র্য, উপযুক্ত খাদ্যের অভাব, বাসস্থান সম্পর্কিত গলদ, কৃষি ও শিল্পের অনুন্নতি ও মাথা-পিছু ব্যয়ের স্বল্পতার ফলে পল্লী আজ শ্মশানের মত ভয়ঙ্কর।

ভারত পল্লীপ্রধান দেশ। সাত লক্ষ গ্রাম লইয়া ভারত গঠিত। এদেশের শতকরা ৯০ জন লোক গ্রামে বাস করে। তাই আমাদের প্রধান লক্ষ্য হওয়া উচিত পল্লীগুলির সংস্কার সাধন। পল্লী অঞ্চলে ও পল্লীবাসীদের মধ্যে আজ কুশিক্ষা, ব্যাধি, দারিদ্র্য, কুসংস্কার ও সঙ্কীর্ণতা যে ব্যাপক ভাবে দেখা দিয়াছে ইহার মূলে আছে পল্লীবাসীর শিক্ষার অভাব।

ইহাদের সবগুলিই জাতীয় জীবনে প্রভাবিত হইয়াছে। আজ ভারতের সর্ব্বাপেক্ষা বড় শত্রু অশিক্ষা। সুতরাং আমাদের প্রধান কর্ত্তব্য গ্রামে গ্রামে প্রকৃত শিক্ষার বিস্তার। গ্রামে গ্রামে প্রাথমিক শিক্ষা বিস্তারের প্রসারের চেষ্টা করিতে হইবে। মহাত্মা গান্ধীর ওয়ার্দ্ধা-পরিকল্পনা অনুযায়ী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষা প্রচারের ব্যবস্থা করিতে হইবে। অশিক্ষার ফলেই আমাদের গ্রামবাসীরা স্বাস্থ্যোন্নতির চেষ্টা করে না।

হাজার হাজার কৃষক ও গৃহ-শিল্প শ্রমিকের যে উপযুক্ত সংগঠন শক্তির অভাব রহিয়াছে শিক্ষার বলে তাহা দূর করিতে হইবে। তাহাদের স্থায়ী খাদ্যাভাব দূর করিতে হইবে। আমাদের কৃষকেরা দিনের পর দিন অক্লান্ত পরিশ্রমে আমাদের জন্য খাদ্য প্রস্তুত করে, কিন্তু তাহাদের গৃহের দিকে দৃষ্টিপাত করিলে দেখা যায় অধিকাংশ গৃহই ছাদ বিহীন, কৃষকদের অধিকাংশই তাহাদের স্ত্রী পুত্রকে দুবেলা উদর পুর্তি করিয়া খাইতে দিতে পারে না।

গ্রামের আর্থিক ও সামাজিক অবস্থা দিন দিন ক্ষয়িষ্ণুতার মুখে। সাম্রাজ্যবাদীর শাসন এবং শোষণ গ্রামের শিল্পগুলির বিলোপ সাধন করিয়াছে এবং গ্রাম-গুলিকে সর্ব্বতোভাবে কৃষিপ্রধান করিবার চেষ্টা করিয়াছে। ফলে গ্রামে গ্রামে কুটীর শিল্প বিস্তারের সুযোগ ও ঘটেই নাই; উপরন্তু একখণ্ড জমি যতগুলি লোকের ভরণপোষণে সমর্থ তাহা অপেক্ষা বেশী লোক তাহাতে ভিড় করিয়াছে। তাই আমাদের গ্রামে গ্রামে কুটীর শিল্পের পুনঃপ্রবর্তন করিতে হইবে। তাহাতে গ্রামের উদ্বৃত্ত লোকের কর্ম্ম সংস্থান হইবে। গ্রামবাসী-গণকে শিল্প বিষয়ে শিক্ষাদান করিবার ব্যবস্থা করিতে হইবে। Bombay Economic and Industrial Survey Committee সুপারিশ করিয়াছেন শিল্প সম্বন্ধে বুনিয়াদী শিক্ষা গ্রামবাসীদের মধ্যে হাতে কলমে দেওয়া হইবে। শিল্পশিক্ষা বিদ্যালয়ে কারিগরী শিক্ষার সুবন্দোবস্ত ডিরেক্টর অব ইণ্ডাষ্ট্রিস্‌কেই করিতে হইবে। কোন কোন ক্ষেত্রে তাঁহাকে সমস্ত টাকা দাদন দিবার ব্যবস্থা করিতে হইবে এবং তাহাদের উৎকৃষ্ট যন্ত্রপাতির ও বন্দোবস্ত করিতে হইবে। ভারতের অভাব, অভিযোগ অর্থনৈতিক সমস্যা প্রভৃতির সমাধানের জন্য প্রণালীবদ্ধভাবে পল্লীসংগঠনের প্রয়োজন। দুনিয়ার অন্য দেশের তুলনায়

আশুতোষ কলেজ পত্রিকা (১৩৫৬)

সম্পাদক-সংঘ

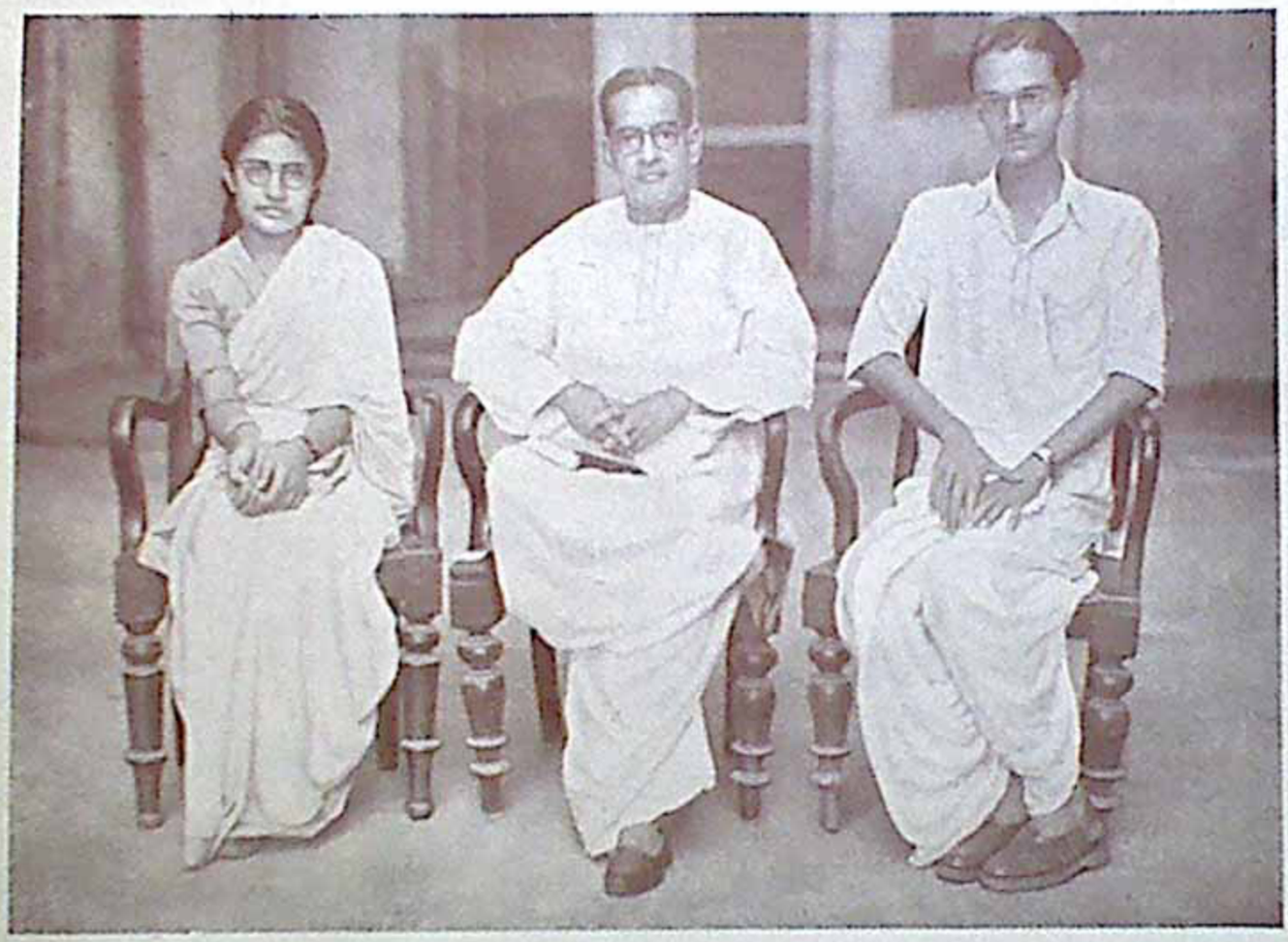

(বাম হইতে দক্ষিণে)—জয়শ্রী চৌধুরী, অধ্যাপক শ্রীমোহিনী মোহন মুখোপাধ্যায়, শ্রীসত্যেন্দ্র নাথ মুখোপাধ্যায়

Council of the Asutosh College Students Union (1948-49)

MORNING DEPARTMENT

Standing : (From Left) – Romala Niyogy, Supriya Chakravarty, Arati Ganguly, Sujata Ghosh, Seba Mukherjee, Rama Chatterjee, Purabi Bose, Arati Bose, (Games Secretary) Bani Ganguly, (Cultural Secretary) Chitra Roy, (Social Secretary) Archana Dutta, (Comon-Room Secretary)

Sitting : (From Left)—Prof. Aruna Sen Gupta, (Vice-President) Prof. Arundhati Sen, (President) Principal Kalidas Sen, Sabita Sen, (Generel Secretary) Kabita Singha, (Astt. General Secretaey)

ভারতে কলেরা, বসন্ত ও অন্যান্য রোগের আধিক্য দেখা যায়। এই তিন রোগে যথাক্রমে বৎসরে ১ লক্ষ, ৮৭ হাজার, ৬৯ হাজার ও ৪২ হাজার লোককে ভবলীলা সম্বরণ করিতে হয়। তাহা ছাড়া কুষ্ঠ, সিফিলিস ও গণোরিয়া রোগে আক্রান্ত লোকের সংখ্যাও খুব বেশী। পল্লী সম্পর্কে বর্তমান ভারত সরকার ও জনসাধারণ বিশেষ সচেতন হইয়াছেন। বৃটিশ ভারতের জনস্বাস্থ্য সম্পর্কে তদন্ত করিয়া ভবিষ্যৎ উন্নতির পরিকল্পনা স্থির করিবার জন্য ভারত সরকার স্যর জোসেফ ভোরের নেতৃত্বে এক কমিটি গঠন করিয়াছিলেন, দুই বৎসর কাল এদেশের জনস্বাস্থ্য সম্পর্কে তদন্ত, আলোচনা ও গবেষণা চালাইয়া এই কমিটি যে রিপোর্ট দিয়াছেন পল্লী উন্নয়নে তাহা বিশেষ প্রণিধান যোগ্য।

ভারতের জনস্বাস্থ্যের উন্নতির জন্য ভোর কমিটির পরিকল্পনা দুইটি স্কীমে বিভক্ত :—

(১) দীর্ঘ মেয়াদী

(২) স্বল্প মেয়াদী

দীর্ঘ মেয়াদী পরিকল্পনা অনুযায়ী প্রথমতঃ গ্রামাঞ্চলের প্রতি ১০ হাজার লোক পিছু একটি করিয়া প্রাথমিক চিকিৎসা কেন্দ্র, দ্বিতীয়তঃ প্রতি ৬ লক্ষ লোক পিছু একটি করিয়া মাধ্যমিক চিকিৎসা কেন্দ্র ও তৃতীয়তঃ প্রতি জিলায় একটি করিয়া সদর চিকিৎসা কেন্দ্রের কথা বলা হইয়াছে।

ডাক্তার ও নার্সেরা কেবল রোগীর চিকিৎসা কার্য্যেই ব্যাপৃত থাকিবে না। বাসস্থান, পানীয় জল ও আহার বিহার সম্পর্কে যথোপযুক্ত জ্ঞান প্রচার করিয়া গ্রামবাসী দিগকে স্বাস্থ্যরক্ষা ও রোগ প্রতিরোধের কাজে সহায়তা করিবেন। স্বল্পমেয়াদী পরিকল্পনায় ৫ বৎসর করিয়া দুইটি পিরিয়ড ঠিক করা হইয়াছে। ১ম ৫ বৎসরে ও ২য় ৫ বৎসরে পরিকল্পিত সংখ্যক চিকিৎসা কেন্দ্র, হাসপাতাল ও ডিস্পেন্সারীসমূহের বিস্তারিত ব্যবস্থার নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে।

ভারতে জনস্বাস্থ্যের উন্নতির জন্য ভোর কমিটির উপরোক্ত নির্দ্দেশ ও পরিকল্পনা আমরা খুব সময়োচিত ও সুনিশ্চিত বলিয়াই মনে করি।

এই পরিকল্পনার বিশেষত্ব উহাতে পল্লীঅঞ্চলে চিকিৎসার সুবন্দোবস্তের উপর জোর দেওয়া হইয়াছে। ধনী গরীব নির্বিশেষে সকল লোকের জন্যই চিকিৎসা ও স্বাস্থ্যোন্নতির বিধান পরিকল্পিত হইয়াছে।

কুসংস্কার রোধের মানসে ও স্বাস্থ্যোন্নতির জন্য গ্রামে গ্রামে ম্যাজিক লণ্ঠনের সাহায্যে বক্তৃতা করিতে হইবে। স্বাস্থ্য সম্বন্ধে মাতৃভাষায় লিখিত উপযুক্ত প্রচার পত্র বিতরণ করিতে হইবে। গ্রামে গ্রামে কৃষির উন্নতি সাধনের ব্যবস্থা একান্ত প্রয়োজন। উৎকৃষ্ট সার সরবরাহ ও কৃষি সম্বন্ধে গ্রামে গ্রামে ফসল বাড়ানোর চেষ্টায় সরকারের সক্রিয়তার যথেষ্ট আভাস পাওয়া যাইতেছে। সম্প্রতি খাদ্যসচিব ঘোষণা করিয়াছেন যে ১৯৫১ সালের মধ্যে ভারতকে খাদ্য সম্বন্ধে ভারতকে স্বাবলম্বী করা হইবে। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যাইতে পারে বিহারের সিন্ধি নামক স্থানে যে সারের কারখানার নির্ম্মাণ কার্য্য আরম্ভ হইয়াছে—১৯৫০ সালের প্রথম হইতেই তাহা হইতে সার পাওয়া যাইবে। বর্তমান সময়ে গ্রামে গ্রামে চাষীদের ফসল বাড়ানোর কাজে উৎসাহিত করা হইতেছে। উৎকৃষ্ট সেচের ব্যবস্থার জন্য কেন্দ্রীয় গভর্ণমেণ্ট ও প্রাদেশিক গভর্ণমেণ্ট আর্থিক ও সম্ভবমত অন্যান্য সাহায্য করিতে চাহিয়াছেন। পশ্চিম বঙ্গ গভর্ণমেণ্ট একমাত্র বাঁকুড়া ও মেদিনীপুরের জমিতে জলসেচের ব্যবস্থার জন্য ২৭ লক্ষ ৮ হাজার টাকা ব্যয় করিবার সিদ্ধান্ত করিয়াছেন।

দীর্ঘ সংগ্রামে কংগ্রেস আজ জয়যুক্ত। স্বাধীন ভারতে আশা করা যায় গ্রামে গ্রামে ফসল বাড়ানোর কাজ পূর্বাপেক্ষা দ্রুত গতিতে সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হইবে। কৃষি-কার্য্যের সমস্যা সাধন করিতে হইলে প্রথমেই কৃষি-ঋণদান সমিতির ব্যাপক প্রসার করিতে হইবে। ভারতে বর্তমান কৃষিঋণদান সমিতির সংখ্যা ১ লক্ষ এবং মূলধনের পরিমাণ ১ শত কোটি টাকা। কৃষকের ঋণ ১৮ শত

কোটি টাকা। সুতরাং দেখা যাইতেছে সমবায় সমিতিগুলির মূলধন অকিঞ্চিৎকর। সরকারকে সমবায় সমিতিতে কিছু মূলধন দাদন করিতে হইবে। যুদ্ধপূর্ব্ব জাপানের শিল্প ব্যবস্থা এশিয়ার জাতি সমূহের আদর্শ স্থানীয় ছিল। উন্নত ধরণের বীজ সরবরাহ, বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে সার প্রস্তুত করণ, আবাদী জমির প্রতি অংশের সদ্ব্যবহার, স্থায়ী জলসেচের ব্যবস্থা জাপানকে কৃষি সম্বন্ধেও আদর্শ স্থানীয় করিয়াছে। জাপানে এই উন্নত ধরণের প্রচেষ্টাকে অনুসরণ করিতে হইবে। ইহা ছাড়া কৃষকদের মধ্যে অল্প সুদে টাকা ধার দেওয়ার ব্যবস্থা করিতে হইবে। মহাজনী প্রথার সংস্কার সাধন করিতে হইবে। কুসংস্কার দূরীকরণ, নৈতিক ও মানসিক উন্নতির জন্য গ্রামে গ্রামে পাঠাগার, শিক্ষা কেন্দ্র প্রভৃতির ব্যবস্থা করিতে হইবে।

আমাদের গ্রাম্য কৃষকেরা অক্লান্ত পরিশ্রমে আমাদের জন্য খাদ্য উৎপাদন করে। এই উৎপাদিত শস্য এমন এক শ্রেণীর লোকের হাতে গিয়া পড়ে যাহাদের কাছ হইতে কৃষকেরা খাদ্যের অল্প পরিমাণ মূল্যই পাইয়া থাকে, ফলে কৃষকদের অবস্থা আরও শোচনীয় হইয়া পড়ে। তাই কৃষক এবং শিল্পীদের পণ্য সরকারী ব্যবস্থায় উচ্চমূল্যে বিক্রয়ের সুব্যবস্থা করিতে হইবে। যথামূল্যে পণ্য ক্রয় ও বিক্রয়ের জন্য সমিতি গঠন করিতে হইবে।

একথা আমাদের স্মরণ রাখিতে হইবে যে ভারতের স্বাধীনতা নবলব্ধ। বহু জটিল সমস্যা আজ আমাদের সম্মুখীন। এমতাবস্থায় কোন সমস্যারই রাতারাতি সমাধান সম্ভবপর নহে। ধৈর্য ও তিতিক্ষার সহিত আমাদের লক্ষ্যের দিকে অগ্রসর হইতে হইবে। মহাত্মা গান্ধীর "গ্রামে ফিরিয়া যাও" বাণীর সারবত্তা বুঝিতে হইবে। ভারতের প্রকৃত পরিচয় নগরের রমণীয় অট্টালিকার মধ্যে মিলিবে না, দূরবর্ত্তী গ্রামের কৃষক, মজুরদের মধ্যেই তাহার প্রকৃত পরিচয় মিলিবে, দেশে বর্ণহীন সমাজ প্রতিষ্ঠার পথে "এই সব মূঢ় ম্লান মুখে দিতে হবে ভাষা, এই সব শ্রান্ত, শুষ্ক, ভগ্ন বুকে ধ্বনিয়া তুলিতে বহে আশা"। আর এই আশা জাগান ও ভাষা দেওয়ার ব্যাপারে রাষ্ট্রের ও জন-শক্তির সহযোগিতা ও উদ্যম কাম্য; আবার পরিকল্পনার সাফল্যের জন্য যেমন জনসাধারণের আগ্রহ ও অধীরতা থাকা চাই, তেমনি তাহাদের কর্ম্মপ্রেরণাকে সুসংবদ্ধ করার জন্য চাই জনগণের সঙ্গে পরিকল্পনার যোগাযোগ।

প্রশ্ন

গোপাহেমাঙ্গী চৌধুরী
তৃতীয় বর্ষ (কলা)

জগৎ গড়েছ তুমি আনন্দ আবেশে
হে ঈশ্বর! তাই তব মহিমা প্রকাশে
তুচ্ছতম কীট হতে অনন্ত অম্বর।
দুঃখশূন্য, ব্যথাশূন্য তোমার অন্তর
সৃষ্টি লয়ে অনুক্ষণ করে শুধু খেলা;
হে নিষ্ঠুর, নির্বিকার, একান্ত একেলা,—
আপন সৃষ্টির ব্যথা দুই পায়ে দলে
প্রকাশ' মহিমা তব শূন্যে, জলে, স্থলে!
কারো কাছে তুমি নাহি নত কর মাথা,—
সৃষ্টিরে রাখিয়া পায়ে সেজেছ বিধাতা!

মানুষ তোমারই সৃষ্টি? যত দুঃখভার
অসঙ্কোচে তাই দিলে মাথায় তাহার?
ভাষা দিলে, সুর দিলে—কণ্ঠ তার ভরে—
সে কি শুধু কীর্ত্তি তব প্রকাশের তরে?
শুনিয়াছি, তব সৃষ্টি আনন্দের মেলা!
তবে কেন, হে বিধাতা, মানুষের বেলা
সে বিচিত্র আনন্দের কণামাত্র আর
পড়িল না ব্যথা-জীর্ণ জীবনে তাহার?
মানুষের দুঃখ ব্যথা করি উপভোগ
ভেবেছ তোমার সৃষ্টি হয়েছে অমোঘ?

মিথ্যা কথা। আমি জানি, মিথ্যা এই কথা।
মানুষই করেছে সৃষ্টি আপন বিধাতা
অন্তরের বেদনা মথিয়া। সংগোপনে
রাখিয়াছে তারে একান্ত নিভৃত কোণে
সর্ব দুঃখ-জ্বালা হতে লয়ে বহু দূরে
বাঁধিয়াছে স্নেহ প্রীতি-সম্বন্ধের ডোরে।
আপন সৃষ্টির পায়ে নত করি মাথা
জানায়ে গিয়াছে তার অন্তরের ব্যথা!
দেবতারে দিয়া দুঃখ-বেদনা অপার
মানুষ করেনি ভোগ লীলা আপনার!

হে দাম্ভিক সৃষ্টিকর্তা, দেখ চোখ চেয়ে
মানুষের ব্যথা তব আনন্দ ছাপায়ে
সমগ্র জগৎ প্লাবি' বহি অসংকোচে
নব নব রূপে পুনঃ তোমারে গড়িছে,—
অদৃশ্য কল্পনা হতে কঠিন বাস্তবে,
তোমারই অর্চনা করি আপন গৌরবে।
তুমি সৃষ্টি রাখিয়াছ নিজ পদতলে,—
সে তোমারে গড়িয়াছে তপ্ত অশ্রুজলে।
তব সৃষ্টি তব চোখে শুধু রমণীয়,—
সে তোমার চিরভক্ত—তুমি তার প্রিয়!

জগতের বিচারক, বল এইবার
শ্রেষ্ঠ বলি কারে লবে জগৎ সংসার?

নারী

উষা বন্দোপাধ্যায়—তৃতীয় বর্ষ (কলা)

দীঘির কালো বুকে পড়েছে তাল-তমালের ছায়া, ছোট ছোট ঢেউএর দোলায় জলের তলা থেকে ভেসে উঠেছে শৈবালদাম এপারের ঝরাপাতা গিয়ে ঠেকেছে ওপারে যে ওঁড়িটা পড়ে আছে জলের ধারে তারই কোলে। বহু পুরাতন ফাটল-ধরা ঘাটের ধাপে ধাপে ছড়িয়ে আছে বকুল ফুল—রোদে বৃষ্টিতে ক্ষীণ নুয়ে-পড়া বকুল গাছে এখনও ফুল ফোটে অজস্র, বকুল ফুলের মদির গন্ধে মদির হয়ে ওঠে সন্ধ্যানিল। আকাশের চাঁদ যখন শত টুকরো হয়ে মিশে যায় দীঘির কোলে, তখন সুর-সাগরের বাঁশীর সুর সাড়া জাগায় গ্রামগ্রামান্তরে।

সুরসাগর একাধারে কবি ও সুরশিল্পী। দিনের বেলায় সে লেখে গান, রাত্রিকালে সে দেয় তার গানে সুর। সকালে তার দেখা পাবে মাঠের ধারে গাছের ছায়ায়, সন্ধ্যা হতে না হতেই তার বাঁশীর সুর জাগে ঘাটের ধারে বকুলগাছের তলায়। ঝির্‌ঝিরে বাতাসে কাঁপে পাতা, ছোট ছোট ডাল,—ফুলের আসন বিছানো থাকে মাটির পরে।

গ্রামের মেয়ে কুন্দ—নিতান্তই সরল ও শান্ত। না জানে সে তার আগুলফ চুলের রাশিকে পরিপাটী করে বাঁধতে, বিশাল চক্ষে না পড়ে কাজল রেখা, মোটা শাড়ী-খানি আলুথালু ভাবে জড়িয়ে থাকে তার তনু কিশোর দেহটাকে। কখন সে এসে দাঁড়ায় কবির পাশে—কবির ছায়ায় মিশে যায় তার ছায়া। কবি মুখ তোলে—উজ্জ্বল চোখে চেয়ে থাকে কুন্দর মুখের পানে। "আজ তুমি ঝুমকো ফুল দিও খোঁপায়, আঁচলখানি লুটিয়ে দিও মাটীতে, আঁকবো তোমায় প্রতীক্ষমাণার ভঙ্গীতে, পুরবী সুরে গাইব আমার কথার মালা"—কুন্দ খুশী হয়ে ওঠে অবোধ আনন্দে, বোঝে না সে কিছু, শুধু জানে কবিকে সে জোগায় অনু-প্রেরণা, কবি গান লিখবে তাকে নিয়ে। সন্ধ্যার অন্ধ-কারে ক্ষীণ কটিতে কলসী বহন করে কুন্দ আসে দীঘির ধারের বকুলতলায় যেখানে কবি বাজায় বাঁশী। গৃহবধূরা চকিতে একবার তাকিয়ে ঘোমটা তুলে দেয় মাথায়, ত্রস্তপদে ফিরে যায় কাজ শেষ করে। কুন্দই শুধু পিছিয়ে পড়ে, বাঁশীর উদাস সুরে তার বুকের মধ্যে যে কান্না গুমরে ওঠে, তারই অভিব্যক্তি দু'চোখের জলে ঝরে পড়ে।

কুন্দর বিয়ে হবে। বর তার তারই মত সাধারণ, গ্রামান্তরে আছে তার সামান্য মুদীর দোকান, তৈলচিক্কণ সবল চেহারা, মুখে চোখে অশিক্ষিত বোকামীর ভাব। কুন্দ দেখেছে তাকে ; তার এক সইএর স্বামীর বন্ধু, এই গ্রামে এসেছে সে কতবার তার বন্ধুর সঙ্গে। কুন্দ দেখেছে সুরসাগরকে, মনে লেগেছে সুরের মায়া, বাস্তবকে আর তার ভাল লাগে না। মৃদুপদে সে এসে উপস্থিত হয় কবির গানের সভায়। কবি উচ্ছ্বসিত হয়ে বলে, "তুমি বধূবেশে এসে দাঁড়িও আমার সামনে। তোমার চন্দন-চর্চ্চিত মুখশোভা, নতুন চেলির আড়ষ্টতা গয়নার ঝিকি-মিকি দেবে আমায় নতুন উপাদান—এবার গাইব আমি মিলনের গান। আসবে তো ?" গ্রামের মেয়ের ঠোঁট কেঁপে ওঠে, নিঃশ্বাস পড়ে দ্রুততালে, শুধু একবার মাথা নেড়ে ফিরে যায় সে স্খলিত পদে।

শ্বশুরবাড়ী যাবার পথে কুন্দ নেবে পড়ে মাঠের ধারে। শূন্য দৃষ্টিতে চেয়ে থাকে তার আবাল্যের লীলাভূমির দিকে, কৈশোরের স্বপ্নরাজ্যের পানে। দূর থেকে কবি দেখতে পায় না তার চোখের জল, পালি তার ঘোমটা ঢাকা মূর্ত্তিটা যেন হতাশার প্রতিচ্ছবি বলে মনে হয়। ক্রমে পালকী চলে গেল মেঠো পথ ধরে। সুরসাগর নতমস্তকে ফিরে গেল তার ঘরে, সেদিন লেখা হোল না কোন গান। কি যেন হয়েছে সুরসাগরের। তার কণ্ঠে আসে না

ভাষা, সুর কোথায় যেন কেটে যায়। কুন্দ আর আসে না সকাল-সন্ধ্যায় তার কাছে, গানও আর রচনা করা হয় না। অবশেষে একদিন বাঁশী হাতে গ্রাম ছেড়ে চলে গেল সুরের সাধক।

বৎসরাধিক পরে আবার কবি ফিরে এলো গ্রামে। পথ ভোলাতে পারে নি ছায়া-ঢাকা দীঘির মায়াকে—কি এক দুর্বার আকর্ষণ নিয়ে এলো তাকে দিনের শেষে সেই বকুলগাছের তলায়। তখনও সন্ধ্যা হয় নি—আকাশের বুক চিরে উড়ে গেল কলমুখর বুনো হাঁসের দল।

কবি চমকে তাকাল। কে আসে ঐ ঘাটের পথটী ধরে? কুন্দ এসে দাঁড়াল সুরসাগরের সামনে। লালপাড় শাড়ীটী বেষ্টন করে আছে তার সুঠাম যৌবনপুষ্ট দেহ-বল্লরীকে, চলায় একটী সলাজ ভঙ্গী। কোলে তার একটী নধর শিশু—সরু সুতোয় ঝোলান মাদুলি গলায়, চোখে ঘন কাজল, হাতে রাঙ্গা ঝুমঝুমি। বড় বড় চোখ দুটী মেলে চেয়ে আছে সে অবাক হয়ে, একটী হাতে গভীর নিশ্চিন্তে জড়িয়েছে মার গলা। কবি হঠাৎ উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠে—"কুন্দ, সরিয়ে দাও তোমার ছেলেকে। আজ তুমি নারী; মাথায় দাও ফুলের রাশি, চোখে কাজল পায়ে আলতা—আজ তোমায় দেখতে চাই অভিসারিকা রূপে"।

উচ্ছলকণ্ঠে হেসে ওঠে কুন্দ: "আমাকে নিয়ে কবিতা লিখে কার কি উপকারটা হবে শুনি? ভাল করে একটা ঘুমপাড়ানি গান লিখে দিতে পারো? খোকাটা যা দুষ্টু হয়েছে আজকাল! কিম্বা আমার খোকা কেমন কোরে 'বাব্‌বা, বাব্‌বা' বলে, তাই নিয়ে একটা কবিতা লিখতে পারো তো চেষ্টা করে দেখো।"

আশুতোষ কলেজ
বাংলা সাহিত্য-সমিতির বার্ষিক কার্যবিবরণী (১৩৫৬)

'A nation is known by its literature-এটা খাঁটি সত্য। এই সত্যকে বাঙালী উপলব্ধি করতে পেরেছিল বলেই তাদের ভিতর পেয়েছিল চণ্ডীদাস-বিদ্যাপতির ন্যায় বৈষ্ণব কবিকে, বঙ্কিম-শরতের ন্যায় বিশ্ববিখ্যাত ঔপন্যাসিককে ও মাইকেল-রবীন্দ্রের মত শ্রেষ্ঠ কবিকে; এবং সেই জন্যই বাঙালী আজ জগতের নিকট পরিচিত, বাঙালীর সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য আজ একটা যুগান্তর সৃষ্টি করতে সমর্থ হয়েছে। সুতরাং সাহিত্য যে জাতীয় জীবনের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত সে কথা আজ আর বলা বাহুল্য মনে করি। কিন্তু বর্তমান যান্ত্রিকতার যুগে যে সত্যিকার সাহিত্যিক পরিবেশ সব দিক দিয়ে কলুষিত হচ্ছে এটা বোধ হয় আজ চিন্তাশীল ব্যক্তি মাত্রেই বুঝতে পারছেন। সুতরাং এই যুগ-সন্ধিক্ষণে সবচেয়ে হুঁসিয়ার হয়ে চলা প্রত্যেক সাহিত্যসেবীর প্রয়োজন।

আজ যে শিশু, কাল সে প্রৌঢ়। আজ আমাদের এই ছাত্র সমাজই কাল হয়ত 'বঙ্কিম-শরৎ-রবীন্দ্র' হয়ে উঠবে। তাই আমাদের ছাত্র-সমাজের উপর ভবিষ্যৎ বাঙলার সাংস্কৃতিক, সামাজিক ঐতিহ্য নির্ভর করছে—যা' সর্বতোভাবে প্রকাশ পায় জাতীয় সাহিত্যের ভিতর দিয়ে। আমাদের ভিতর সকলেই যে সাহিত্যিক নয়—একথাও যেমন সত্য, আমাদের ভিতর অনেকেই যে সাহিত্যিক—এটাও তেমনি সত্য। আবার এটাও ঠিক যে আমাদের ভিতরকার সাহিত্যরস অকালেই শুকিয়ে যায়, যার জন্য দায়ী সাহিত্যিক পরিবেশ ও চর্চার অভাব। সুতরাং আমাদের এই সাহিত্যিক রুচি ও প্রচেষ্টাকে সাফল্যমণ্ডিত করবার পক্ষে এবং তা' পবিত্র করে গড়ে তোলবার পক্ষে প্রয়োজন প্রতি স্কুল কলেজে সাহিত্যামোদী ছাত্রদের দ্বারা সাহিত্য সমিতি প্রতিষ্ঠা।

অত্যন্ত সৌভাগ্যের বিষয় এই যে আশুতোষ কলেজে 'বাঙলা সাহিত্য সমিতি' বলে তদ্রূপ একটি প্রতিষ্ঠান অনেকদিন থেকে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে যা' প্রতিটি সাহিত্য-রসিক ছাত্রকে সাহিত্যালোচনায় ও সাহিত্যমনের স্ফুরণের সহায়তা করছে। চলছে বছরের ২রা ফেব্রুয়ারীতে এবারকার সাহিত্য সমিতির কার্য্যকরী পরিষদ গঠিত হয়েছে। যে সমস্ত সদস্য নির্ব্বাচিত হয়েছেন তাঁরা প্রত্যেকেই সত্যিকার সাহিত্য-দরদী এবং আমাদের সমিতিকে নিজেদের প্রচেষ্টাদ্বারা সত্য-শিব-সুন্দরের স্পর্শে অপূর্ব্ব করে তুলবে-এ আশা করি। এই সমিতির প্রধান আদর্শ যেটা, সেটা হ'ল—সাহিত্যকে সাহিত্য করে দেখা ও সাহিত্যানুশীলনের ভিতর দিয়ে বাঙলা সাহিত্যকে আরও উন্নততর পর্য্যায়ে উন্নীত করা। প্রতি সপ্তাহে সাহিত্য সমালোচনা, প্রাচীর পত্রের সাহায্যে প্রত্যেকের সাহিত্যিক প্রতিভা বিকাশের সহায়তা করা গল্প, কবিতা, নাটক ও প্রহসন ইত্যাদির ভিতর দিয়ে এবং মাঝে মাঝে সাধারণ সাহিত্য অধিবেশনে খ্যাতনামা সাহিত্যিকদের উপস্থিতিতে বাংলা সাহিত্যের ক্ষেত্রটি নানা দিক থেকে পর্য্যালোচনা ও সাধারণের ভিতর সাহিত্যিক-রস জাগ্রত করা সাহিত্য সমিতির বিশেষ কার্য্য। আমাদের বর্ত্তমান সাহিত্য সমিতির কার্য্যকরী সমিতি প্রথম থেকেই তাদের যথা সাধ্য চেষ্টা করছে একে সুষ্ঠুভাবে উজ্জ্বল ভবিষ্যতের দিকে এগিয়ে নিয়ে যেতে। আশা করি ছাত্র-বন্ধুদের সহযোগীতা পেলে তা' অসম্ভব হবে না কখনও।

এ বৎসরের কার্য্যকরী সমিতিতে নিম্নোক্ত ছাত্রবৃন্দ সদস্যরূপে নির্ব্বাচিত হয়েছেন। সভাপতি হয়েছেন অধ্যাপক শ্রীঅনিলকুমার চক্রবর্ত্তী মহাশয়।

সহঃ সভাপতি :—শ্রীমনোতোষ ধর

সাধারণ সম্পাদক :—শ্রীঅজিতকুমার বক্সী

সহঃ সাধারণ সম্পাদক :—শ্রীপ্রবীর চট্টোপাধ্যায়

এ ছাড়া সদস্য হিসাবে রয়েছেন—

(১) অশোক দেব
(২) সুনীল চট্টোপাধ্যায়
(৩) বীরেন দত্ত
(৪) অরুণ বন্দ্যোপাধ্যায়
(৫) দীপেন চট্টোপাধ্যায়
(৬) বদ্রীনারায়ণ ভট্টাচার্য
(৭) জ্যোতিলাল রায়
(৮) অরুণোদয় বন্দ্যোপাধ্যায়
(৯) চিন্ময় চট্টোপাধ্যায়
(১০) যামিনী কয়াল
(১১) ননীগোপাল ঘোষ
(১২) অজিত চট্টোপাধ্যায়
(১৩) সাতকড়ি মুখোপাধ্যায়
(১৪) নরোত্তম কুণ্ডু
(১৫) অজিত সরকার
(১৬) অমল শঙ্কর ভাদুড়ী
(১৭) সত্যেন মুখোপাধ্যায়

সম্পাদক :
অজিত বক্সী

অস্তাচলের গান

অধ্যাপক শ্রীঅমিয়রতন মুখোপাধ্যায়

বহুকাল পরে অরুণের সাথে দেখা হলো ট্রামে যেতে।
মলিন বস্ত্র, বিষণ্ণ মুখ, আভাহীন আঁখিতারা,
আধপাকা চুল তৈলবিহীন—একি অরুণের ছবি ?
যে-ছবিতে ভাই দেখেছি অযুত সূর্যের স্বর্ণাভা,
দেখেছি অতুল মহাজীবনের অতল সম্ভাবনা—
সে কি এই, এই দারিদ্র্যলীন, বিশীর্ণ দীনহীন—
হেরি যারে চোখে জল আসে, বুকে ব্যথা বাজে অহরহঃ ?
মুঠোর ভিতর লুকাতে গেলাম হীরার আঙটি দুটো,
জামার হাতায় ঢাকিলাম দামী সোনার ঘড়িটা মোর।
—ভালো আছ ভাই ?
শুধালাম। হাসি' কহিল সে
—ভালো আছি।
'ভালো আছি'! শুনে চোখে এলো জল, বসিলাম মুখ ফিরে।
লাজুক অরুণ দূরে গেল সরি' হেরি' হেন ব্যবহার।
হয়তো রচিল মনে মনে কত ব্যথাহত অভিমান,
হয়তো ভাবিল বাজে কথা যতো : প্রেম পৃথিবীতে নাই,
সুসময়ে প্রেম জেগে গান করে, অসময়ে তোলে হাই।
আলিপুরে ট্রাম থামিল। অরুণ উঠিল আসন ছাড়ি'
কহিল
—বন্ধু, চলি তবে।
হায় চলে গেল, ওই গেল,
আমার অরুণ, শিল্পী অরুণ, প্রতিভাদীপ্ত কবি
ভাবী উদয়ের কোল হতে সরি নেমে গেল চুপে চুপে
অস্তাচলের আঁধার-কবরে : নেমে গেল আলিপুরে,—
আলিপুর-কোর্টে অরুণ-প্রতিভা করিছে মুহুরিগিরি।
আমি জননেতা, স্বদেশের প্রিয়, কথার সব্যসাচী—
বিশ্বকবির বচন বাখানি' লোচনে তপন হানি'
লজিকের বুকে ভাবাবেগ ঠুকে প্রমাণ করিতে পটু :

মানবজীবনে ব্যর্থতা নাই, নাই নাই পরাজয়—
সাধনা যেখানে সত্য, সেখানে উদয়ের বরাভয় !

আমি জননেতা, কণ্ঠে আমার অতুল ওজস্বিতা,
মস্তকে মোর মণীষার মণি, ভারতে ভীষণ নাম,
সিন্দুকে ভরা সোনা দানা হীরে, গৃহে রূপময়ী প্রিয়া,
রন্ধনশালে খানসামা, দ্বারে নেপালী ভোজালী হাতে,
গ্যারাজে মোটর, ট্রামে যে চলেছি, ট্রামেরি ভাগ্য সেটা।

—সাধনা যেখানে সত্য, সেখানে উদয়ের বরাভয়।
সাধনা করেছি বস্তুতো, বলো নহিলে কেমনে হবে
লাখপতি-গৃহে জন্ম, কেমনে আসিব পৃথিবী ঘুরে
এক আনা যবে উপায় করি নি, করি নি পরিশ্রম ?
কেমনে আসিবে আমেরিকা হতে দু-জোড়া 'ডক্টরেট্' ?
কেমনে সহজে মহারথীদের লভিব আশীর্বাদ—
দেশে না-ফিরিতে দেশনেতা হয়ে লভিব মন্ত্রিগিরি ?
আমি জননেতা, বাণীগুলো মোর একরোকা চোখা-চোখা
বুলেটের মতো বুকে গিয়ে বেঁধে ; তরুণ ছাত্র-সভা
আগুনের মতো দুলে' দুলে' নাচে, ফুলে' ফুলে' ওঠে ফাঁপি'
কাঁপি কাঁপি প্রাণ করে আনচান গাহে গান কামনার,
গাহে গান কত সাধু স্বপনের :
—স্বাধীন ভারতে দেখো
সাধনার বলে আমি হবো ভাই ভারতীয় 'লিংকন'।
—গান্ধীটা ভোঁদা, নামে সে বেনিয়া, কাজে ছিল সন্ন্যাসী,
অহিংসা ছেড়ে শান্তির নামে দিতে কিছু বক্তৃতা
কেন যে বিদেশে গেলে না !
—বন্ধু, আমি জগদীশ বোস।
আবিষ্কারের মাথা চাই, তাই পড়ছি আই. এস্. সি।
জি. ডি. বিড়লার আদর্শ নাও, জীবনে আসবে জয়।
—আমি হবো ভাই শ্রীরামকৃষ্ণ : টাকা মাটি, মাটি টাকা,
গড়বো নূতন বিবেকানন্দ।
—সাধু সাধু, জটা রাখ্।

অস্তাচলের গান

—আমি কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ, নূতন কাব্য লিখে
এনে দেব দেশে নোবেল প্রাইজ।
—কমরেড সব, শোনো
—চুপ্ চুপ্, দলে টিক্‌টিকি আছে।
—পরোয়া করি না কোনো,
বুর্জোয়া যতো ভাবুকের দলে যেয়ো নাক একজন-ও।
যাদেরে তোমার আদর্শ ভাবো—
—তোমাকে ভাব্‌বো না কি?
—কাছা ধরে ওকে বসিয়ে দে তো রে!
—আমি গামা পালোয়ান
পাঁজাকোলা করে' ধরবো পৃথিবী, সাধু-বাবা সাবধান!
—কাজ করে যাই, ফলে কাজ নাই, যা' হবে তা' ঠিক হবে।
—হিয়ার ইউ আর, বল্‌লি যা ভায়া, বেড়ে বলেছিস্ তেড়ে
অমুক বাবু-ও হেরে যাবে, এই, আস্‌ছে ও-শালা পিছে
হয়তো ও-শালা শুনে নেছে সব।
চলে গেছি পাশ দিয়ে—
প্রাণে নিয়ে কম-কৌতুক, গানে স্বপনের বিলাসিতা,
যৌবনে জগ-জিগীষা, শুধু রে আজ অরুণের সাথে
দেখা হয়ে গেল, দেখা হয়ে গেল, কেন দেখা হয়ে গেল?
—তোমার কবিতা বাজারে বেরুলে দেখো অরু, তুমি দেখো
নাম হবে খুব।
—ছাই হবে, ভাই আমি যে গরীব বড়।
—শুনে রাখো অরু, গোর্কীর মত শেষে তুমি পাবে জয়।
শুনে রাখো, ভাই, তোমার রচনা অতুল আদর পাবে।
হাসি? হেসো নাক, নিজেরে কোর না ছোট।
—কী যে বলো তুমি।
বেশী কিছু আমি চেয়েছি কি ভাই কোনদিন, কোনরাত?
আমি চাই শুধু দুবেলা দুমুঠো হাসি মুখে খেতে পেতে
আমি চাই, ভাই সুখী সংসার মা যেথা কাঁদে না ক্ষোভে,
বিয়ে দিতে হবে বোনেদের বলে' আসে না দুর্ভাবনা,
বাবা যায় নাক গোপনে গোপনে কাবুলিওলার বাড়ি।
আমি চাই, ভাই, তকতকে সাদা একটি নিরালা গৃহ
মনের মতন সাজানো গোছানো সামান্য আসবাবে:
একটি টেবিল, একটি চেয়ার, পাশে দুটি আলমারী
ভালো ভালো যতো বই দিয়ে ভরা, টেবিলে দোয়াত দানি,
দুটি ফুলদানি, তাজা-তাজা-ফুলে ফুলদানি দুটি ভরা,
চারিটি কলম, কয়েক দিস্তে ভালো কাগজের থাক,
ব্লটিং পেপার বেশ কতগুলি, কতগুলি ভালো 'নিব',
পিন্‌ভরা প্যাড্, সাদা খাম আর গঁদের একটি শিশি।

আমি চাই, মোর জিনিসপত্র যত্নে সাজাতে নিতি
সেবাময়ী এক প্রেমসঙ্গিনী সরলা, বিনয়ানতা
পড়া জানা যার মাঝামাঝি, আর মুক্তোর মত লেখা,
মুক্তোর মত—ওকি হাসছিস্, না না কাঁদছিস্ কেন ?
চোখে কেন জল ?
—কবি কি না, তাই বড় বেশি বাজে বকো।
—আর বক্‌বো না। বিনয়, বন্ধু, তোকে আমি সব বই
উপহার দেব ছাপা হলে পর।
—তখন তো ভুলে যাবে ?
—ভুলে যাবো ? তোকে ? তোকে ভুলে যাবো ? ঠাট্টা
করিস্ বুঝি ?

ক্ষণতরে থামি :

—যদি কোনদিন নাম পাই, যশ পাই—
ব্যথিত বুকের স্বপন কাহিনী যদি আনে নব-সুর
মরু-পৃথিবীর মরু-প্রাণে, যদি আমার বাসনা-বাণী
দেয় আনি' ভাই নবজীবনেরে, যদি দেশ খুসি হয়ে
ভালো করে' মোরে খেতে শুতে দেয়···তুই-আমি দুইজনে
'জলার' ওপারে নির্জনে রচি' দুখানি 'বাঙলো'—আহা,
রচি' প্রীতিভরে ফুলের বাগান ঠিক তারি সম্মুখে,
রবো একসাথে। তোর বউ আর মোর বউ—দুটি মেয়ে
খুব ভাব করে' রবে গলাগলি—সেবা আর প্রেমে সুখে
দুটি সখা আর দুটি সখী, মোরা রচিব জগৎ নব।

পুনঃ থামি :

—ভাই, আশা আছে মোর, গান আছে প্রাণে প্রাণে,
আছে এ-হৃদয়ে বলার মতন অযুত স্বপনবাণী ;
কি করবো ভাই দারিদ্র্য-জালে বাঁধা পড়ি হাতে-পায়ে
এতটুকু নড়ে এগোতে পারি না ; শুধু চোখ বুজে বুজে
অলসের মতো হেরি সুস্বপন : আসে শুভদিন মোর
আসে শুভদিন কুদিনের অরি—মাত্র দুদিন বাকি···
মাত্র দুদিন বাকি আছে, হায়, দুদিন কাটে না আর।
—কেটে যাবে ভাই কালো কেটে যাবে অরুণ-অভ্যুদয়ে,
আকাশে আকাশে উদিবে এবার নূতন আলোর ভাষা ;
জাগিবে সমর বড় প্রীতিময় অভিজাতে গ্লিবিয়ানে
রবি ও অরুণে·····অসিতে অসিতে ঠিকারিবে নবজ্যোতি ;
এক আর এক, দুই রথে ভাই দ্রোণ ও ধনঞ্জয়,
সাত আর সাত চোদ্দ ঘোড়ার বাজিবে বিজয় ভেরী।
কেটে যাবে ভাই কালো যাবে কেটে···
—এত কি চাইছি আমি ?

অস্তাচলের গান

—চাও বা না চাও পাবে তুমি কবি, বুকে আছে ভগবান,
বুকে ভগবান আছে, কবি, তুমি জয় পাবে একদিন,
একদা ভূলোক পাবে মহালোক অরুণ অভ্যুদয়ে !

যা বলেছি তা-ই, কালো আর নাই, আলো পাই চারিভিতে,
যেদিকেতে চাই দেখিবারে পাই দেখিতে না-চাই যাহা।
অন্ধ আমার আবরণে ধরা বন্ধ ছিল-বা যেন
সহসা দুচোখ পেল মহালোক অরুণ অভ্যুদয়ে :
মলিন বস্ত্র, বিষণ্ণ মুখ, চুলগুলি উস্কুখুস্কু
গালদুটি তোবড়া চোয়ালেতে, নীল চোখ দুটি বসা-বসা,
যে-চোখে একদা...হাসিনু খানিক···ভগবান ভগবান !
কাঁদিনু খানিক : ভগবান নেই ? বুক করে দুরু দুরু।
ছুটে চলে ট্রাম, থামে আর চলে, কত লোক ওঠে, নামে,
ওঠা আর নামা চলে অবিরাম শহরের গতিপথে।
পলকে পলকে কত ছবি ফোটে, কত উদয়ের ছবি,
কত না অকাল অস্তাচলের বুক-ভাঙা ম্লান রবি !
ছুটে চলে ট্রাম।

—ভালো আছ ভাই ?
—ভালো আছি। তুমি ভালো ?

চেহারা দেখে কি বুঝিতে পারো না, জিজ্ঞাসা করা কেন ?
কে না জানে আমি দেশের মন্ত্রী, বিখ্যাত জননেতা,
মস্তকে মোর মনীষার মণি, ভারতে ভীষণ নাম,
সিন্দুকে শত সোনাদানাহীরে, গৃহে রূপময়ী প্রিয়া,
রন্ধনশালে খানসামা, দ্বারে নেপালী ভোজালী হাতে,
গ্যারাজে মোটর, নূতন মডেল, মুখে জ্বালাময়ী গীতি :

"দুর্গম গিরি-কান্তার মরু
দুস্তর পারাবার
লঙ্ঘিতে হবে রাত্রে নিশীথে
যাত্রীরা হুঁশিয়ার,—"

হুঁশিয়ার দল যাত্রী সকল করে কোলাহল শুনি
কবির বয়ান শুণে পায় প্রাণ শত মুখে গুন্‌গুনি' :

—রাশিয়ায় যাবো।
—আমি, আমেরিকা।
—আমি ভাই শুধু কবি

এনে দেব দেশে নোবেল প্রাইজ রবি ঠাকুরের মতো।

আমরা ও ছাত্রাবাস

১৬ বসন্ত বসু রোড

সাহিত্য, সংস্কৃতি ও সভ্যতা প্রত্যেক জাতিরই গৌরবের বস্তু। আমরাও ভারতের সাহিত্য, সংস্কৃতি ও সভ্যতার গৌরবে গৌরবান্বিত। তাই ডাঃ নীহাররঞ্জন রায়ের পৌরোহিত্যে কবীন্দ্র রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের মৃত্যুদিবস ২২শে শ্রাবণ অত্যন্ত শ্রদ্ধা ও নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করেছি।

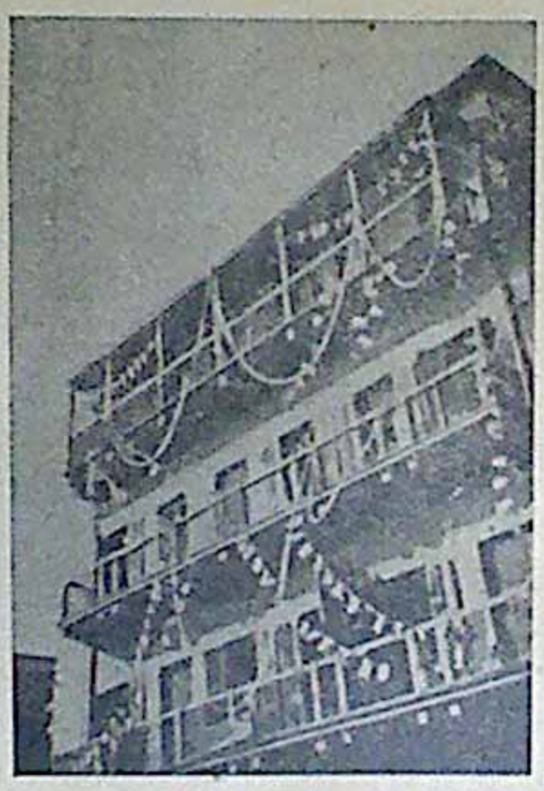

তারপর ২৩শে জানুয়ারী,—সুভাষচন্দ্রের জন্মতিথি। দেশের আর দশজন মানুষের মতই গভীর নিষ্ঠা ও ভক্তিসহকারে সেদিন পালন করেছিলাম। সেই শুভদিনে পতাকা উত্তোলন করেছিলেন অধ্যাপক শ্রীরমণীমোহন রায়। সপ্তাহকাল শেষ না হতেই আবার এলো হৃদয়-বিদারক সেই ৩০শে জানুয়ারী। জাতির জনক মহাত্মা গান্ধীর মৃত্যুদিবস পালন করলাম আমরা অব্যক্ত ব্যথা ও বেদনার ভিতর দিয়ে।

তারপর এলো সেদিন যেদিন সারা দেশ উঠল বিশ্বরূপা বাণীর বীণা-ঝঙ্কারে মুখরিত হয়ে। সংস্কৃতি সম্পাদক শ্রীবিশ্বজিৎ সেনগুপ্ত ও সহকারী সাধারণ সম্পাদক শ্রীঅসিৎ দে'র আপ্রাণ চেষ্টায় আমাদেরও বাণীবন্দনা সার্থক হয়ে উঠল সেদিন।

খেলা ধূলায় আমাদের ছাত্রাবাসের আবাসিকগণ মোটেই পশ্চাদপদ নয়। খেলাধূলার পরিচালক শ্রীভাস্কর বসুর সুনিয়ন্ত্রণে আমাদের খেলোয়ার দল বাইরের বহু দলের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় জয়ী হয়ে এবারও ছাত্রাবাসের সুনাম রক্ষা করেছে।

ছাত্রাবাসের 'কমন রুম'-সম্পাদক ছিলেন শ্রীঅমর মিত্র। তার সুষ্ঠু পরিচালনশক্তি প্রশংসনীয়। এবারকার ক্যারম প্রতিযোগিতায় শ্রীসুজিৎ দে সর্ব্বোচ্চ স্থান অধিকার করেন।

দরিদ্রভাণ্ডারের তত্ত্বাবধায়ক ছিলেন শ্রীমনোজ মুখোপাধ্যায়। তার দূরদর্শিতা ও চেষ্টার ফলে এবার আমরা প্রকৃত দরিদ্রকে যথাসাধ্য সাহায্য করতে পেরেছি।

ছাত্রাবাসের শান্তি ও শৃঙ্খলা বজায় রাখা অত্যন্ত দায়িত্বপূর্ণ কাজ। এই দায়িত্বপূর্ণ কাজে নিযুক্ত থেকে শ্রীসুরজিৎ সেনগুপ্ত যে কর্ম্মকুশলতার পরিচয় দিয়েছেন সেজন্য তিনি আমাদের ধন্যবাদার্হ।

কর্ত্তব্যময় জীবনযাত্রার সঙ্গে সহজ সরল আমোদও আমরা উপভোগ করতাম। এবার নূতন ও পুরাতন ছাত্রাবাসের আবাসিকগণ একসঙ্গে মিলিত হয়ে 'বোটানিক্যাল গার্ডেনে' বনভোজন করতে গিয়েছিলাম। আমাদের সৌভাগ্য এই যে এবার আমরা 'ভাইস চ্যান্সেলার'কে সঙ্গে নিয়ে গ্রুপ ফোটো তুলেছি।

আর কিছু বলবার নেই। ভাবী কর্ম্মপরিষদ আমাদের ত্রুটি-বিচ্যুতি সংশোধন করে ছাত্রাবাসের গৌরব বৃদ্ধি করবে—এই আশাই করছি। সাধারণ সম্পাদক: শ্রীঅশোককুমার মজুমদার।

BOARDERS OF ASUTOSH COLLEGE HOSTEL

16, BASANTA BASU ROAD

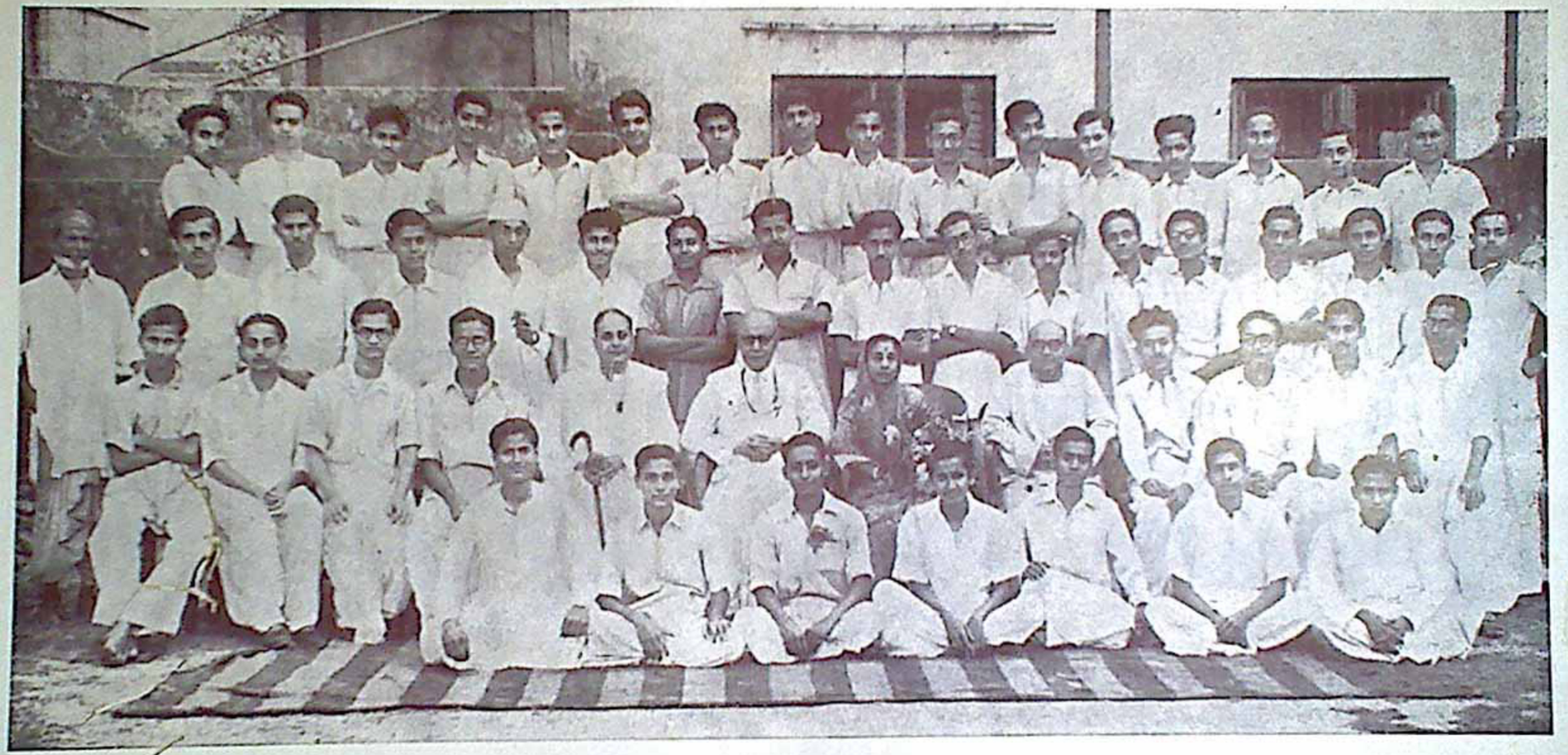

(On Chair)—5th from the right Prof. Sukumar Bhattacharyya, (Superintendent) Mrs. Banerjee, Mr. P. N. Banerjee (Vice-Chancellor C. U.) Principal S. Mukherjee.

Boarders of Asutosh College New Hostel

22, Kalighat Road

On Chair : (4th from the left) – Principal S. Mukherjee, 5th, Prof. N. Bhattacharyya, (Suprintendent)

আশুতোষ কলেজ নতুন ছাত্রাবাস

২২ কালীঘাট রোড

আমাদের নূতন ছাত্রাবাসের সম্বন্ধে কিছু লিখতে বস্‌লেই প্রথমে মনে পড়ে আমাদের বিদায়ী বন্ধুদের কথা। বর্ষচক্রের আর একটি আবর্ত্তন পূর্ণ হ'য়ে এল—হারালাম আমরা আমাদের কয়েকটি একান্ত শুভানুধ্যায়ী সুহৃদকে, তাদের আমরা জানাই আমাদের অন্তরের শুভেচ্ছা। তাদের শূন্য স্থান পূর্ণ করবার ভার নিয়েছে নতুনের দল,—তারা আমাদের সঙ্গে মিশে যাবে; এ আশা আমরা রাখি।

প্রত্যেক ভারতবাসীর স্মরণীয় দিবস ১৫ই আগষ্ট আমাদের মধ্যে এসেছিল এক উৎসবমুখর পরিবেশের মধ্য দিয়ে। আমাদের কলেজের অধ্যক্ষ মাননীয় শ্রীসোমেশ্বরপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় মহাশয় এ-অনুষ্ঠানটির পৌরোহিত্য করেন। বহু খ্যাতনামা শিল্পী ও অধ্যাপকের যোগদান আমাদের উৎসবকে সাফল্যমণ্ডিত ক'রেছিল।

অধ্যাপক শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ ঘোষ মহাশয়ের বিদায় অনুষ্ঠান ছাত্রাবাসের ছাত্ররা এক করুণ আবহাওয়ার মধ্যে সম্পন্ন করে।

এবারের ৺সরস্বতীপূজার কথা উল্লেখ না ক'রে পারছি না এবং এ প্রসঙ্গে ৺পূজা সম্পাদক শ্রীঅসিতানন্দ দাশগুপ্তকে তার অদ্ভুত যোগ্যতার জন্য ধন্যবাদ জানাই। ৺পূজা প্রাঙ্গন সেই সন্ধ্যায় মুখরিত হ'য়ে উঠেছিল শ্রীবরদা গুপ্ত ও শ্রীনিখিলচন্দ্র সেন প্রমুখ শিল্পীদের সুরের ঝঙ্কারে। ৺ডি. এল. রায়ের 'জন্মভূমি' কবিতাটির বাংলা, ইংরাজী ও সংস্কৃত অনুবাদ শ্রীবরদা গুপ্তের কণ্ঠে অত্যন্ত উপভোগ্য হয়।

৺সরস্বতী পূজার পরদিন ছাত্রাবাসের অধ্যক্ষ মহাশয়ের একান্ত চেষ্টায় গড়ে ওঠে প্রাক্তন-ছাত্র-সম্মেলন; এর যুগ্মসম্পাদকের দায়িত্ব নিয়েছেন শ্রীপ্রভাত ব্যানার্জ্জি ও শ্রীদুলালচন্দ্র দেব।

দ্বিতীয় ও চতুর্থ বার্ষিক শ্রেণীর বন্ধুদের বিদায়-অভিনন্দন শেষ হ'ল এক শান্ত পরিবেশের মধ্য দিয়ে; তাদের সর্ব্বাঙ্গীণ সাফল্য কামনা করি। এ সভায় পৌরোহিত্য ক'রলেন অধ্যাপক শ্রীশিবনাথ চক্রবর্ত্তী।

খেলাধূলায় ছাত্রাবাসের ছাত্ররা এবার খিদিরপুর, শালিমার প্রভৃতি স্থানে বিভিন্ন খেলায় বিশেষ কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছে। ছাত্রাবাসের অধ্যক্ষ মহাশয়ের উৎসাহ ও চেষ্টা এই কৃতিত্বের জন্য মূলতঃ দায়ী।

আমরা গৌরবের সঙ্গে জানাচ্ছি যে গত বৎসরের চতুর্থ বার্ষিক শ্রেণীর ছাত্ররা সকলেই উত্তীর্ণ হ'য়েছে। এদের মধ্যে একজন দ্বিতীয় বিভাগে বিশেষ সম্মান লাভ ক'রেছে এবং ৪ জন কৃতিত্বের সহিত উত্তীর্ণ হ'য়েছে।

ছাত্রাবাসের অধ্যক্ষ মহাশয়ের চেষ্টায় একটি পাঠাগার স্থাপিত হ'য়েছে; আমরা এই পাঠাগারের উন্নতির আশা রাখি।

সত্যিকারের আনন্দ পেয়েছিলাম সেদিন শিবপুর বোটানিক্যাল গার্ডেনে বেড়াতে গিয়ে। আমাদের দুই ছাত্রাবাসের ছাত্রেরা সেদিন একত্র মিলিত হবার সুযোগ পেয়েছিল, ক'রেছিল নিজেদের মধ্যে ভাবের আদান প্রদান। প্রাকৃতিক দুর্য্যোগ সেদিন আমাদের একটুও দমিয়ে দিতে পারে নি। ছাত্রাবাস দুইটির অধ্যক্ষদ্বয়, এবং শ্রীজিতেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী, শ্রীপ্রমথেশ রায় ও শ্রীশিবনাথ চক্রবর্ত্তী প্রমুখ অধ্যাপকগণ আমাদের আনন্দ বর্ধন করেন।

ছাত্রাবাসের ছাত্রদের পরস্পরের প্রীতি ও সৌহার্দ্য এবং অধ্যক্ষ মহাশয়ের একান্ত স্নেহ আমাদের ছাত্রাবাসকে একটি সুখী পরিবারে রূপান্তরিত ক'রেছে।

শ্রীঅমরকুমার চট্টোপাধ্যায়,
সাধারণ সম্পাদক

"ভূবিজ্ঞান পরিষদ"

সকল দিকে বিদ্যার পরিধি বর্দ্ধিত করাই বর্ত্তমানে প্রতি দেশের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের কর্ত্তব্য, কিন্তু ভারতের বহু শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এখনও সেদিকেই লক্ষ্য করেন নাই।

আমাদের দেশের অবজ্ঞাপ্রাপ্ত শিক্ষাগুলির মধ্যে ভূগোল বিদ্যা অন্যতম। এই বিদ্যাকে উপযুক্তভাবে আয়ত্ত করিয়া পশ্চিম অপর সকলের পুরোভাগে দাঁড়াইয়াছে। কিন্তু আমরা এখনও সচেতন নই। পশ্চিমের দেশগুলি তাহাদের প্রতি দেশ-সংগঠক পরিকল্পনায় (Recovery plan) কাজে ভৌগোলিকদের স্থান ও ভূগোল বিদ্যার মান আজ অপর সকল বিদ্যার সঙ্গে সমান ভাবেই দিয়াছে। কিন্তু আমাদের দেশের এমন কি শিক্ষাবিভাগও তাহা করিয়া উঠিতে পারেন নাই।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে ও তাহার অধীনস্থ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিতে যে পরিমাণ ভূগোল শিক্ষার ব্যবস্থা আছে তাহা অপেক্ষা আরও বেশী আমরা আশা করি। কলিকাতায় যে সকল শিক্ষায়তনে ভূগোল শিক্ষার ব্যবস্থা আছে তাহার মধ্যে আমাদের কলেজ অন্যতম। শুধু অন্যতম নয়—আমাদের কলেজে সর্ব্বপ্রথম ভূগোল শিক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থা হয়—এমন কি বিশ্ববিদ্যালয়েরও পূর্ব্বে। নানা ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্য দিয়া এই বিভাগটি তাহার কাজ করিয়া যাইতেছে। প্রথম যখন আরম্ভ হইয়াছিল তখন ইহার অবয়ব ছিল অতি নগণ্য। কিন্তু আজ সেই অবস্থা নাই ; ক্রমশঃ কলেবর বর্দ্ধিত হইয়া চলিতেছে।

•

গত ১৬ই মার্চ্চ ১৯৪৯ ভূবিদ্যা বিভাগের সকল ছাত্র-ছাত্রীরা এক মিলিত সভায় "ভূবিজ্ঞান পরিষদ" নামে এক পরিষদ স্থাপন করেন। নিম্নে তার বিবৃতি দেওয়া হইল।

কার্য্য নির্ব্বাহক সমিতি

পৃষ্ঠপোষক—অধ্যক্ষ শ্রীকালিদাস সেন এম. এ.

সভাপতি—অধ্যক্ষ শ্রীসোমেশ্বর প্রসাদ মুখোপাধ্যায় এম. এ. বি. এল.

সহ-সভাপতি—অধ্যাপক শ্রীরেবতী রমণ দে বি. এস্‌সি. বি. টি.

সম্পাদক—অধ্যাপক শ্রীরণজিৎ লাহিড়ী এম. এস্‌সি.

সহ-সম্পাদকদ্বয়—শ্রীঅশোককুমার দেব ও শ্রীলীনা সেন

সভ্যগণ—আরতি সরকার, বেলা মুখোপাধ্যায়, সাতকড়ি মুখোপাধ্যায়, অহীন্দ্র রায়, মীরা চট্টোপাধ্যায়, হেলেন গুহ, অশোক বসু ও হীরেন্দ্র ঘোষ।

স্থায়ী সহ সভা

প্রকাশনা—সম্পাদক মণ্ডলী

প্রধান সম্পাদক—অধ্যাপক শ্রীরণজিৎ লাহিড়ী এম্, এস্‌সি

সভ্যগণ—শ্রীঅরুণা চক্রবর্ত্তী, গীতা দাসগুপ্ত, অমিয় দে, অশোককুমার দেব, খনা বন্দোপাধ্যায় ও দেবব্রত ঘোষ।

(২) পাঠচক্র—সংগঠকমণ্ডলী

শ্রীঅরুণা চক্রবর্ত্তী ও শ্রীঅশোককুমার দেব।

(৩) ভৌগোলিক পর্য্যটন-সংগঠকমণ্ডলী

শ্রীগীতা দাসগুপ্ত ও শ্রীকৌশিক কুমার দাস।

•

গত ১৩ই ফেব্রুয়ারী, ৪৯ তৃতীয় বার্ষিক ছাত্রেরা ডায়মণ্ড হারবারে অধ্যাপক শ্রীরণজিৎ লাহিড়ীর নেতৃত্বে এক ভূ-পর্য্যটনে যায়। তথাকার সংগৃহীত দ্রব্যাদি ও ছবি বিভাগীয় পরীক্ষাগারে আছে ও ভ্রমণ বৃত্তান্ত বিভাগীয় পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছে।

•

গত ফেব্রুয়ারী মাসে প্রাতবিভাগের তৃতীয় বার্ষিক শ্রেণীর ছাত্রীরা বেলুড়ের National Iron and Steel Industry-র কারখানা পরিদর্শনে গিয়াছিলেন। তাহার বৃত্তান্ত খুব শীঘ্রই বিভাগীয় পত্রিকায় বাহির হইবে।

•

গত ২৭শে ফেব্রুয়ারী ৪৯ তারিখে ভূবিজ্ঞান পরিষদের উদ্যোগে পরিষদের সভ্য-সভ্যাদের United States Informations Service এর শিক্ষামূলক চলচ্চিত্রের এক প্রদর্শন হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন অধ্যাপক শ্রীরেবতী রমণ দে মহাশয়।

•

গত ৪ঠা এপ্রিল, ৪৯ তারিখে ভূবিজ্ঞান পরিষদের উদ্যোগে প্রাতবিভাগের ছাত্রীদের British Information Service-এর শিক্ষামূলক চলচ্চিত্রের এক প্রদর্শন হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন অধ্যাপক শ্রীমোহিনী মোহন মুখোপাধ্যায় মহাশয়।

শ্রীলীনা সেন
শ্রীঅশোককুমার দেব
সহ-সম্পাদকদ্বয় :
"ভূবিজ্ঞান পরিষদ, আশুতোষ কলেজ"

ঐতিহাসিক সফর

শ্রীপ্রদ্যুৎ কুমার সেনগুপ্ত

তৃতীয় বর্ষ, (কলা)

১৯৩৮ সালের ১৫ই অক্টোবর অধ্যাপক শ্রীসুকুমার ভট্টাচার্য্য এবং অধ্যাপক শ্রীসুরেশ দে মহাশয়ের তত্ত্বাবধানে আমরা নিম্নলিখিত ইতিহাসের ছাত্রবৃন্দ আগ্রা অভিমুখে রওনা হইলাম।

(১) শ্রীসুনীল চট্টোপাধ্যায় (২) শ্রীসমীর দত্ত (৩) শ্রীদিলীপ দত্ত (৪) শ্রীসৌরেন চৌধুরী (৫) শ্রীঅচিন্ত্য মুখোপাধ্যায়—ও (৬) শ্রীপ্রদ্যুৎ কুমার সেনগুপ্ত।

১৬ই অক্টোবর আমরা আগ্রায় পৌছিলাম। সেখানে চিরসুন্দর তাজমহল ছাড়াও ঐতিহাসিক সেকেন্দ্রা, স্বানীবাগ, আগ্রা কেল্লা, ইতিমদ্দৌলার স্মৃতি সৌধ প্রভৃতির সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ হইয়াছিলাম। আগ্রা হইতে পচিশ মাইল দূরে ফতেপুর সিক্রী দেখিতে গেলাম। সেখানকার দ্রষ্টব্য স্থানগুলির মধ্যে দেওয়ানী-খাস, জুম্মা মস্‌জিদ প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।

১৯শে অক্টোবর—আমরা বৃন্দাবন আসিয়া পৌছিলাম। সেখানে গোবিন্দদেবের মন্দির, গজেন্দ্র কুণ্ড, ব্রহ্মচারী মন্দির, গোপীশ্বর মন্দির, বংশীতট ও কালীর মন্দির দেখিলাম। এই গোবিন্দদেবের মন্দিরের একটু বিশেষ ইতিহাস আছে। পূর্ব্বে এই মন্দির সাত তলা বিশিষ্ট ছিল এবং প্রতি সন্ধ্যায় ইহার শীর্ষদেশে একটি প্রদীপ প্রজ্বলিত থাকিত। সম্রাট ঔরঙ্গজেব ইহার অনেকাংশই ভাঙ্গিয়া দেন। ইহা ছাড়া শ্রীকৃষ্ণের জন্মস্থানের উপরে যে সুন্দর মন্দির ছিল ঔরঙ্গজেব তাহা ভাঙ্গিয়া তথায় সুন্দর একটি মস্‌জিদ নির্ম্মাণ করেন। এই মন্দিরে হিন্দু ও মোগল স্থাপত্যের নিদর্শন যুগ্মভাবে পাওয়া যায়।

ঐ দিনই রাত্রি ৮টায় আমরা দিল্লী পৌছিলাম। দিল্লীতে দুর্গ, কুতুবমিনার, বিড়লা ভবন দেখিলাম। বিড়লা ভবনে মহাত্মা গান্ধীর মৃত্যুস্থলের উপর একটি বেদী নির্ম্মিত হইয়াছে। জুম্মা মস্‌জিদ সম্রাট সাজাহানের অক্ষয় কীর্ত্তি। কেল্লার উপরাংশে বৃটিশ মিউজিয়মে প্রাচীন ভারতের সেনানীদের অস্ত্র শস্ত্র, বর্ম্ম, পোষাক-পরিচ্ছদ ইত্যাদি সযত্নে রক্ষিত আছে।

৪ দিন দিল্লীতে অবস্থান করিয়া ২৪শে অক্টোবর আমরা লক্ষ্ণৌ পৌছিলাম। এখানে ছোট ও বড় ইমামবাড়া ও লক্ষ্ণৌ রেসিডেন্সি দেখিলাম। ইমামবাড়া দুইটি ১৭৮৪ খৃষ্টাব্দে সম্রাট আকবরের সময় নির্ম্মিত হয়। ইহার উপরে বিখ্যাত গোলকধাঁধা অবস্থিত।

২৫শে অক্টোবর এলাহাবাদে আসিয়া আমরা এলাহাবাদ দুর্গ ও খসরুবাগ দর্শন করিলাম। 'অক্ষয় বট' সম্রাট অশোকের সময় হইতে আছে। খসরুবাগে জাহাঙ্গীরের জ্যেষ্ঠপুত্র খসরুর স্মৃতিসৌধ আছে। খসরুর সমাধির দক্ষিণে তাহার মাতা যোধাবাঈ এবং বামপাশে তাহার ভগিনীর সমাধি।

পরের দিন আমরা বারাণসী পৌছিলাম। ভগবান বুদ্ধ সর্ব্বপ্রথম এখানে ধর্ম্মপ্রচার করেন। এই দিনই আমরা বিশ্বনাথ ও অন্নপূর্ণার মন্দির দেখিলাম। পরের দিন হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয় ও ভারতমাতার মন্দির দেখিলাম।

২৮শে অক্টোবর আমরা বিহারের প্রাচীন নগর রাজগীরে পৌছিলাম। রাজগীরে আমরা অজাত-শত্রুর দুর্গ ও প্রাসাদ এবং ত্রেতা যুগের জরাসন্ধের ধনাগার দেখিলাম। পরের দিন আমরা নালন্দা বিশ্ব-বিদ্যালয় দেখিতে গেলাম। এই বিশ্ববিদ্যালয়টি গুপ্ত-রাজের পৃষ্ঠপোষকতায় স্থাপিত হয়। ইহা সম্রাট হর্ষবর্দ্ধনের সময় গৌরব লাভ করে। ইদানিং মাটি খুঁড়িয়া নালন্দার ভগ্নাবশেষ আবিষ্কৃত হইয়াছে। বিখ্যাত প্রত্নতাত্ত্বিক ৺রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের পুত্র শ্রীঅমীশ বন্দ্যোপাধ্যায়

এখানকার স্বাগত্য বিভাগের ভারপ্রাপ্ত কর্ম্মচারী। তিনি নালন্দার ইতিহাস অতি যত্নের সহিত আমাদের বুঝাইয়া দেন।

৩০শে অক্টোবর আমরা গয়া পৌছিলাম। বিষ্ণুপদ্ম মন্দির দেখিয়া আমরা বুদ্ধগয়া দেখিতে গেলাম। এইখানে বোধি বৃক্ষের নীচে ধ্যান করিয়া রাজকুমার সিদ্ধার্থ বুদ্ধত্ব লাভ করেন। এই দিন রাত্রে আমরা গয়া ত্যাগ করিয়া পর দিন কলিকাতা আসিয়া পৌছিলাম।

আমাদের ইতিহাসের জ্ঞানের পরিধি যাহাতে বৃদ্ধি পায় তার জন্যই এই সফরের আয়োজন। সেজন্য এই ভ্রমণ বৃত্তান্তের নাম 'ঐতিহাসিক সফর' দেওয়া হইয়াছে। তবে আমাদের রসগ্রাহী মন জ্ঞানের সঙ্গে সঙ্গে ভাবের খোরাক যতটা পাইয়াছে, আমাদের জীবনের সঞ্চয়ের খাতায় তার স্থানও নীচে নয়।

বেঙ্গল কেমিক্যাল পরিদর্শন

B. Sc. class এর ছাত্রদের নিয়ে আমাদের "Chemical Society" নতুন গঠিত হয়েছে। অধ্যাপক মহাশয়দের সক্রিয় সহযোগিতাই একাজে আমাদের উৎসাহিত করেছে। কিন্তু বাৎসরিক পরীক্ষার জন্য এর কাজ এগোতে পারেনি। পরীক্ষার পর গত ২৮শে ২৯শে ও ৩০শে এপ্রিল B. Sc. ছাত্রদের পানিহাটীতে Bengal Chemical এর কারখানায় নিয়ে যাওয়া হয়। ওখানে একজন গাইডের সাহায্য পাই। তিনি Acid, Road Tar, Napthaline, Boric Cotton, Soap, Alum প্রভৃতি manufacture এর প্রণালী এবং যন্ত্রপাতির প্রত্যেকটি কাজ, আমাদের কাছে বিশ্লেষণ করেন। অধ্যাপক মহাশয়েরা সঙ্গে থাকায় কোন কিছু বুঝতে অসুবিধা হ'লে তাঁদের সাহায্য পাচ্ছিলাম। এঁদের Alum, Road Tar প্রভৃতি উৎপন্ন দ্রব্য Water Works ও Corporationএর চাহিদা আংশিক মেটায়। গন্ধদ্রব্য ও ঔষধ, Bengal Chemical এর মাণিকতলার কারখানায় তৈরী হয়। এবং সেইসব কাজে এই কারখানায় উৎপন্ন প্রচুর সালফিউরিক এ্যাসিড এদের নিজেদেরই লাগে।

এই জাতীয় শিল্প প্রতিষ্ঠানের কর্তৃপক্ষ ও কর্মচারীদের আচার্যদেবের আদর্শে অনুপ্রাণিত দেখ্‌লাম। আমরা এর উন্নতি কামনা করি।

Chemical Laboratory তে আমরা Chemistry সম্বন্ধে যতটুকু জ্ঞানলাভ করি এই সব manufacture-এর পদ্ধতির সঙ্গে তার সামঞ্জস্য বিধান না করলে রসায়ন শাস্ত্রে আমাদের জ্ঞান অসম্পূর্ণ হয়ে থাকবে। Bengal Chemical দেখে এটুকু আমরা বুঝতে পেরেছি।

বর্তমান শিক্ষাপদ্ধতির অযোগ্যতা বিবেচনায় যাঁরা নতুন শিক্ষাপদ্ধতির উদ্ভাবন করে ছাত্রদের প্রকৃত জ্ঞানদানের পক্ষপাতী, আমাদের অধ্যক্ষ মহাশয় তাঁহাদের অন্যতম। সুতরাং এদিকে আমরা কলেজ কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে বাস্তব সাহায্য কামনা করি। অবশেষে অধ্যাপক মহাশয়দের আমাদের আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই তাঁদের সস্নেহ সাহায্যদানের জন্য এবং ছাত্রদের অধিকতর উৎসাহিত হয়ে এর উন্নতি সাধনে ব্রতী হতে অনুরোধ জানাচ্ছি।

শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়
শ্রীনির্মল সেনগুপ্ত

Asutosh College Cricket Team – 1949

Runners up : Principal S. Roy—Memorial Shield.

Standing : (From Left)—Swapan (Mali), S. Das, A Sen, A Roy Choudhury (Asstt. Games Secretary), D. Sen Gupta, K. Das Gupta, P. Guha, A. Singha (Ex. Games Secretary).

On Chairs : (From Left)—D. Ganguly (Games Secretary), S. Ray, R. Sen, (Captain), Prof. N. Bhattacharyya (In-Charge of Games) Principal S. Mukherjee, Prof. P. Roy (In-Charge of Games), B. Chatterjee (Vice Captain) P. Choudhury, S. Sarkar.

আশুতোষ কলেজ বাঙলা সাহিত্য সমিতি

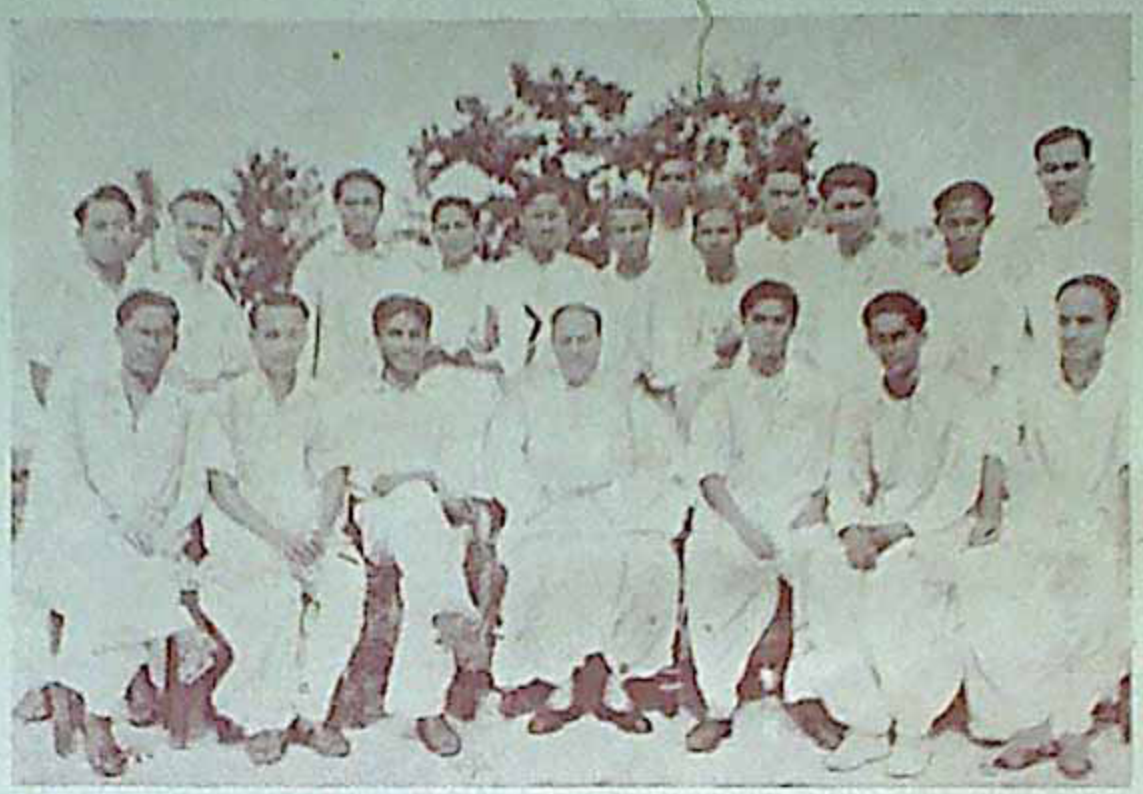

উপবিষ্ট : বাম হইতে—নরোত্তম কুণ্ডু, সাতু মুখোপাধ্যায়, অজিত বক্সী (সম্পাদক), অধ্যক্ষ শ্রীসোমেশ্বর প্রসাদ মুখোপাধ্যায়, মনতোষ ধর (সহঃ সভাপতি), প্রবীর চট্টোপাধ্যায় (সহঃ সম্পাদক) বীরেন্দ্র দত্ত।

দণ্ডায়মান : বাম হইতে—শ্রীঅশোক দেব, অরুনোদয় বন্দ্যোপাধ্যায়, অমল শঙ্কর ভাদুড়ী (কৃষ্টি সম্পাদক-ছাত্রসংঘ), যামিনী কয়াল, অরুণ বন্দ্যোপাধ্যায়, জ্যোতিলাল রায়, অহীন্দ্র নাথ রায়, ননীগোপাল ঘোষ, অজিত চট্টোপাধ্যায়, দীনেন চট্টোপাধ্যায়, অজিত দাস, সুনীল চট্টোপাধ্যায়।

ডায়মণ্ড হারবারে ভূবিজ্ঞান বিভাগের ছাত্রবৃন্দ।

আলোক-চিত্র শিল্পী : শ্রীসুজিত কুমার দে (তৃতীয় বর্ষ বিজ্ঞান)

ASUTOSH COLLEGE PATRIKA

VOL. XXIV, No. 1
MAY 1949

Jt. Editors

SATYENDRA NATH MUKHOPADHYAY
JAYASREE CHOUDHURY

Professor in Charge :-
SREE MOHINI MOHON MUKHERJEE, M. A.

TO STUDENTS

"You have inherited great dreams. You have had great duties laid upon you. You have been bequeathed legacies for whose suffrage and whose growth and accumulation you are responsible. It does not matter where you are and who you are. Even a sweeper of streets can be a patriot. You can find in him a moralising spirit that it can inspire your mind. There is not one of you who is so humble and so insignificant that you can evade the duties that belong to you, and which nobody but you can perform. Therefore, each of you is bound to dedicate his life to the uplifting of his country."—*Sarojini Naidu.*

Shall Spring that wakes mine ancient land again
Call to wild and suffering hearts in vain?
Or Fate's blind arrows still the pulsing note
Of my far-reaching, frail, unconquered throat?
Or a weak bleeding pinion daunt or tire
My flight to the high realms of my desire?
Behold! I rise to meet the destined Spring
And scale the stars upon my broken wing!

—*Sarojini Naidu.*

"Are we not thine, O Beloved, to inherit
The manifold pride and power of thy spirit?
Ne'er shall we fail thee, forsake thee or falter,
Whose hearts are thy home, thy shield and thy altar."

—*Sarojini Naidu.*

"Farewell, O eager faces that surround me,
Claiming the tender service of my days.
Farewell, O joyous spirits that have bound me
With the love-sprinkled garlands of your praise."

—*Sarojini Naidu.*

Asutosh College Patrika

Vol. XXIV MAY 1949 No. 1

EDITORIAL

On behalf of the students of our college we welcome Prof. Mohini Mohan Mukherjee, M.A., who has again been at the helm of our College Patrika. It was he who was responsible for bringing out the "Asutosh College Magazine" years ago in 1924 and piloted it against great odds. Those were days of political repression, grim and black with many a tragedy.

• • • •

With the assumption of independence India has been free from the domination of British rule which lasted over a century and a half. But to laymen independence carries no meaning as long as India's teeming millions are ill fed, ill clad and unemployed. The new government comprises self-sacrificing patriots, who, during the British regime, underwent untold sufferings. Many a patriot are no more with us today. They suffered martyrdom, but their memory will be evergreen. The dedication of their lives at the call of their motherland will surely find a conspicuous place in the annals of modern India. On this occasion and on all occasions we are in duty bound to pay our respectful homage to these great martyrs. The Father of the Nation is no more with us to give us the benefit of his wise guidance in all matters national and international. May he bless us and may his spirit rest in peace!

• • • •

In the domain of religion Bengal produced two mighty sons, Paramhansa Dev and Vivekananda, who by virtue of the simplicity of their character and deep devotion to God, are worshipped by us as god-like men. So also Mahatmaji and Netaji in the field of politics left an indelible mark on the sands of time. Non-violent to the core of his heart, with truth as the motto of his life, Mahatmaji has endeared himself to all, friend and foe alike. Even the tallest among the British praised him: To come in contact with him is to love him. Netaji is the bravest of all leaders that India has hitherto produced. "On to Delhi" and "Quit India" are complimentary

slogans. With the I. N. A., Netaji came as far as Imphal and the flag of India was hoisted there amid the acclamation of soldiers comprising every kind of Indian nationality. Some say that Netaji is alive, and we have a statement from Sri Sarat Chandra Bose to that effect, though it has been repudiated by the Indian Parliament.

• • • •

The Government of West Bengal has been faced with a huge deficit Budget. Refugees from East Bengal, who are near about 35 lacs in Calcutta and suburbs are in the grip of untold sufferings. They are in urgent need of being permanently housed. They badly need employment to keep flesh and bones together. No doubt the Rehabilitation Department is doing everything in the matter. In view of the urgency of the matter all non-official associations, which, in response to a Press Note, have come into existence, should be registered as Government-controlled associations so that they may not be a pawn in the hand of reactionary political parties. Moreover, these associations should be asked to put in plans and schemes with the object of meeting their local grievances. All vacant lands and lands requisitioned during the last war may be utilized for rehabilitation of this vast number of uprooted humanity.

• • • •

West Bengal is in dire need of land to cope with the influx of her population. Birbhum and Manbhum, the inhabitants of which speak Bengali are claimed by West Bengal on the ground that the Congress has pledged the division of the whole of India on a linguistic basis. During the devastating earthquake in Behar Bengal came forward with all earthly help, and it is expected that reciprocal sentiments of goodwill and fellowship will actuate Dr. Sachidananda Sinha and Dr. Rajendra Prasad, who should take a leading part in the matter.

• • • •

With the attainment of independence India is faced with a mighty problem, that of the language to be used as the medium of instruction in schools and Colleges. In order to avoid controversy it may be said that Bengali, Hindi or any other language of South India may be selected as the lingua franca of India.

• • • •

Hailing from Bikrampur, Mrs. Naidu travelled across the whole of Europe. She inculcated in her body and mind all the noble qualities of head and heart of the East and the West. She became the President of the Congress. She died in harness while working as Governor of the U. P. Her oratorical powers kept vast audiences spellbound. Her death is mourned by all sections of people. Hers was a dynamic personality, vivacious and sparkling.

• • • •

The admirers of cricket matches saw for the first time in Free India the cricket match between Indians and West Indies Cricket Players. The game was highly contested and it evoked a keen interest among sport-loving millions. The West Indies players came out with flying colours.

• • • •

Poet Ezra Pound, 63, rheumy-eyed expatriate follower of Mussolini and fascism,

now living out his days in a Washington, D. C. insane asylum (if he ever recovers, he will be tried for treason), won the Bollingen Prize of 1,000 dollars for the *Pisan Cantos*, "the highest achievment of American poetry" in 1948. The election committee, which includes Conrad Aiken, W. H. Auden, T. S. Eliot, Robert Lowell and Katharine Ann Porter, "aware that objections may be made" explained their choice: "To permit other considerations than that of poetic achievement to sway the decision would destroy the significance of the award, and would, in principle, deny the validity of that objective perception of value on which any civilized society must rest".

SATYENDRA NATH MUKHOPADHYAY

THE LINGUA FRANCA OF INDIA

SRI AJIT KUMAR BOSE—Third year, Science

Nowadays it is a controversial topic as to what should be regarded as All-India language. The recent essay by P. N. J, is an enlargement of the clause found in "Nehru's constitution". :

(1) "The National language of the Commonwealth shall be Hindustani which may be written in Nagri or in Urdu character. The use of English language shall be permitted."

(2) "In provinces, the principal language of the province shall be official language of that province. The use of Hindustani and English shall be permitted."

Hindi with its attachment to Sanskrit and with Nagri or a new script, will be more sanskritised, while under patronizing Persian, with its script allowed to Persian and Arabic will be more and more Persianized. Thus these two languages of two scripts will be making a gulf between the Hindus and Muslims of India. If Hindu-Muslim unity is to succeed at any cost, this pandering to the religious sentiment of the two communities should be condemmed. A third medium should be sought to bring about the indispensable unity for the progress and uplift of Indian culture and civilization.

Eminent authorities of politics agree that a common language is one of the main factors in nation building. They also agree that the main factors of nationality is common language. "The use of common medium of expression is of primary importance in bringing about a similar way of things and in development

of common interest and community of idea. Now some one of you will ask me about my opinion, though it is a difficult task to flash the light on the point or some where near the point.

The claim of English as an All-India language, has been brushed off probably because it is a foreign language, and because it is language of conqueror, which is more hateful. A few points given below will just help you to think over the fact whether it may be regarded as the All-India lauguage or not.

Firstly, let us acknowledge with truth and gratitude that English has been the medium of enlightenment, the source of inspiration It showed the buried treasures of our own land and also of the world outside India. To what else can we attribute the pleasant political conciousness and aspiration of Indians but to the knowledge of English language and the attending expansion in our outlook? Secondly, the English language not-withstanding its erratic spelling, empirical pronunciation, mixed origin, indisrciminate borrowings and inconsiderate incorporation of slang and vulgar corruptions, has a greater claim than any other language in the world. If to this vast vocabulary, India adds her metaphysical and philosophical terms in which Sanskrit excels, the resultant produced will be unbeatable. Thirdly, English is spoken in a large area than any other language in the whole world. English holds an unassailable position in the international assemblies of the world, though French is the medium in the League of Nations. Fourthly, why not consider English as a relative of Sanskrit, however remote it may be? While the border dailects of Kashmir can be considered as off-shoots of Sanskrit, why not English which is admittedly a branch of Indo-Aryan Family of Languages?

If English is not taught in the primary standard, the position will be just as it is at present with Hindi as the All-India language. From the various educational census it is known that India has 15,457 secondary schools equipped to teach English. The increase in number of institutions and pupils over 1921 figures were 54% to 85% respectively. In 1931, there were 16 universities in India with 244 arts colleges and 73 professional colleges. The men and women who have been educated in English will not lose touch with the future students of the other countries, as will happen if the vernacular is the only medium of the Indian universities. It is true in all sense that most of the difficulties will vanish if English continues to be the language of administration and in education at institutions. Inter-provincial contact and unity among the educated which have already been established will be much stronger if the English language is retained. The possible disruption and antagonism between Hindus and Muslims may be avoided if English is regarded as one of the all-India languages. The cry against the Indian National Congress that it tries to establish Hindu or Brahmanic supremacy through Hindi will have no foundation. It is also a common fact that the ideas of Gandhi, the scientific discoveries of Bose and Raman, the politics of Nehru and Jinna, the poetry

and philosophy of Tagore could not, have been known within or without India, but for the mastery of English by the educated Indians.

After the battle of Plassey, India lost all her supreme glory. But a few years after, that is, from the time of Rangalal and Rammohan India got the sensational touch of her new freedom. The moral support which India receives to-day is her national aspiration from America, France and England; it would have been possible only by the interchange of ideas through the western tongue. Studying the English language it is clear that we cannot march on and on without its help.

SATYAGRAHA, ITS ART and SCIENCE

KAMAL KUMAR SENGUPTA—Third Year Science.

"I shall work for an India in which the poorest shall feel that it is their country in whose making they have an effective voice, an India in which there shall be no high class or low class of people, an India in which all communities shall live in perfect harmony. There can be no room in such an India for the curse of untouchability or the curse of intoxicating drinks and drugs....women will enjoy the same right as men...This is the India of my dream". Yes, this is the idea of Ram Rajya as was enunciated and tried to be given shape to by a man who is longer amongst us. I mean Mahatma Gandhi. Only a year ago, his fragile body was snatched away from us at a time when his presence was most vitally needed.

The newly achieved independence, through mutual undersdanding has brought to us a new responsibility of building and constructing India of Gandhijis' conception. After years of struggle we have liquidated foreign rule and achieved political independence. To Gandhiji "this is not an end but a means to achieve the final goal of establishing Peoples' Raj".

Gandhiji did not descend from the top. He had come out from amongst the millions of Indians; so he had a special appeal to the masses of the Indian people. The doctrine which he preached throughout his life is one of non-violnce.

I am conscious of my limitations. And I do not pretend to make any critical estimate of the theory of non-violence as evolved by him. I prefer to recapitulate the essence of his teachings and to present the same in this short article.

Gandhiji's philosophy of life is fundamentally a revolutionary one, but with a difference which easily distinguishes him from another class of thinkers, I mean, our Marxist friends. Both believe that humanity is marching forward and a bond of brotherhood or fellowship binds us toge-

ther. Gandhiji formed the opinion that all life in its essence is one and that every man is working consciously or unconsciously in realisation of that unity. This necessitates the faith in a living God. But other schools of social scientists hold the opinion that progress is due to some natural law and has nothing to do with God. The Marxists make a class of people responsible for unjust social order which corrupts the society. On the other hand, Gandhiji believed that sufferings of the people are due to the faults in the individual character. The exsistence of a corrupted social economic system can only be possible (according to Gandhiji), when both the wrong-doer and the wronged work in co-operation with each other. With the refusal of the wronged such a system is sure to break down. According to him the remedy is to bring necessary change in individual character and to take the help of a constructive economic and social programme.

His technique of amending a wrong is a unique one. He believed that unless the means are good, no good results can ensue. Force or coercion will not solve any problem but will intensify the sufferings.

What is the method or instrument with which Gandhiji intended to fight and to purify an unjust social and economic system? The method with which Gandhiji tried to equip himself and us is known as "Satyagraha". In a word, Satyagraha is said to be a "moral equivalent of war."

War had its merits as well as demerits. It develops a sense of responsibility, co-ordinated endeavour, comradeship, courage, enthusiasm and patriotism. On the other hand, it brings corruption, bitterness, violence and such other evil things. In a Satyagraha the good things will be developed and evils rejected. Here we find a splendid accumulation of some noble things shorn of their gloomy aspects. In order to realise the principles of Satyagraha one should first of all grasp the message of non-violence. Gandhiji throughout his life practised non-violence, and the character of his every fight whether against the British Government or against laudlords and capitalists, was purely non-violent.

The main difference between war and Satyagraha is that the former believes in coercion and the latter aims at conversion. According to the war-mongers, it is the inevitable law of nature, and change of heart is impossible to be brought about in the persons in power. A Satyagrahi, on the other hand, believes that with the aid of non-violent non-co-operation the person in power can be made to realise his wrongs and thus dissuaded from wrong-doing. The exploiter can only use his power when the exploited help him by co-operating either out of fear or personal gain. If the exploited refuse to be the tools in the hands of the exploiter, the exploitation ceases to exist.

The technique and the method is a new and noble one. Gandhiji said, "The idea underlying Satyagraha is to convert the wrong-doer, to awaken the sense of justice in him, to show him also that without the co-operation, direct or indirect, of the wronged, the wrong-doer cannot do the wrong intended by him."

The Satyagrahi movement is governed by some rules and regulations. The qualifications which are essential for a fighter

In a Satyagraha movement to possess may be briefly set forth as follows :—

(i) Every Satyagrahi should develop a truly scientific spirit in devising new experiments modifying his opinions as well as steps with growing experience. He should not dogmatically adhere to any particular opinion.

(ii) A Satyagrahi when he intends to remedy a wrong, should not resort to violence even in spite of strongest provocation. He should try to attain a mental state of non-violence.

(iii) The Satyagrahi should conduct his life with perfect discipline. To quote Gandhiji's own words : "Discipline has a place in a non-violent strategy, but much more is required. In a Satyagraha army every body is a soldier and a servant. But at a pinch every Satyagrahi soldier has also to be his own general and leader. Mere discipline cannot make for leadership."

(iv) A Satyagrahi must fight for a clean cause. There can be no Satyagraha in an unjust cause.

(v) Interpretation of Satyagraha includes within its meaning civil disobedience. But to a Satyagrahi, Satyagraha means something more. Gandhiji observed, "only he who has mastered the art of obedience to law knows the art of disobedience to law. Only he who thoroughly knows how to construct may destroy."

(vi) A Satyagrahi must clearly state before launching a movement the specific demands. The demands should be as minimum as possible. Gandhiji's instruction regarding civil disobedience movement is as follows :—"The issues must be definite and capable of being clearly understood and within the power of the opponent to yield." He should then subject the demands to the careful examination and criticisms of the public.

(vii) With the minium demands duly notified, the fighter can launch upon a movement, but he should never try to go beyond his demands even if he receives some accession during fighting. On the other hand, he should not give his objective even if his strength diminishes. A Satyagrahi will stick to his principles till he breathes his last breath.

(viii) Gandhiji gave special stress upon the individual character of a Satyagrahi. He should be so trained as to build up his character devoid of any adverse criticism.

(ix) A Satyagrahi should not exploit the weak point or weak moment of his opponent. In a Satyagraha movement there is no place for disappointment or heart-burning.

(x) Gandhiji's opinion regarding the duty of a Satyagrahi is to preserve a feeling of respect for the personality of his opponent throughout the struggle against

him. His action should not create panic in the breast of the "enemy."

(xi) The Satyagrahi should always try to settle the disputes on honourable terms. Frequent negotiation with the opponent plays a great part in a Satyagraha movement.

(xii) Sometimes it happens that the civil resistance may be directed in fruitless channels due to the inadequate preparation. What should be the duty of a Satyagrahi under such circumstances? Gandhiji resorted to fast unto death under such circumstances with the objective of purifying himself and his environments. But he was not in favour of frequently using this weapon.

In a Satyagraha movement one will try to remedy a wrong through his personal suffering without a trace of bitterness against the opponent. Satyagraha is the last weapon of a fighter and should therefore, be sparingly used. When the doors of compromise have failed then and then only he should launch his movement. But if the wrong-doer rejects the terms of compromise a hundred times, he should be given another chance to correct him. Gandhiji wrote, "since Satyagraha is one of the most powerful methods of direct action, a Satyagrahi exhausts all other means before he resorts to Satyagraha".

Satyagraha has no secrecy. It is an open rebellion. Secrecy has its place in war where diplomacy plays a great part. Gandhiji wrote, "If the method of violence take plenty of training, the method of non-violence takes even more training and that training is much more arduous than the training for violence."

The world around us has become weary of wars. Every one from Truman to Stalin excepting a few war-mongers is sincerely trying to restore peace and tranquillity. But the question is what is the way? Gandhiji showed the world a noble and effective way through the technique of Satyagraha.

I SHALL NOT TARRY

APARNA BHATTACHARYYA—Third year, Arts.

No more shall I tarry,
I have heard your
Bugle blowing free.
Are you standing, O Lord,
On my pathway?
Frequently saw thou, methinks,
From my window-bay.

All my dreams are ended,
The flute of my heart,
By the morning stars, is now played.
Whatever I had worth giving,
My hands are empty, gifts are missing,
Now I will wear on my head
The garland of your blessing.

Translation from Tagore's—"Amar ar habena deri"

INFLATION IN INDIA

SRI BISWANATH CHATTERJEE—Third year Arts (Economics).

One of the most important topics of today is inflation. It is a topic not only of academic interest but also of general interest. What is inflation ? Inflation is as old as money and by it we generally mean a period of rising prices. For example, in U. S. A. we find a trend of rising prices. Also in India we find a similar trend. But inflation in a rich country like America, is not the same thing as inflation in India today.

The main seeds of inflation were sown during the second world war. Imports were cut off, and the supply of food which is available had to meet both civil as well as military demand. Demand increases more than supply to a great extent and the propensity is in the direction of a rise in prices. The quantity of money also increases nearly tenfold, mainly as a result of the Government's creation of money to meet the needs of defence and this contributes mainly to phenomenal rise in prices. Money income has not increased as much as the volume of money. Thus there is inflation. The present rise in prices is due to the acutest shortage of goods in the market. The purchasing power of the people was not fully realised, as a result of which a huge residue of unspent purchasing power remained.

Commodity hoarding is another name for "Flight into commodities" and is an effect rather than a cause of high prices. The same is the case with profiteering. When prices are fast rising, commodities in the hands of businessmen appreciate in value and they turn into profiteers. In addition to this, there is still a large amount of cash in the hands of war-profiteers and black market traders who have not yet been able to invest their surplus cash which is often spent on the limited supply of consumption goods.

These, however, are not the only factors at work. Deficit financing by Central Government and the majority of Provincial Governments has probably been a major factor responsible for post-war rise of prices. It is wellknown that public expenditure has increased by leaps and bounds. The budget of Sri Sanmukham Chetty introduced in February last (i. e. February 1948) started with a deficit of about Rs. 27 crores. Some of the items of expenditure, e. g., those on Kashmir war relief and rehabilitation of refugees and loans to them are probably necessary. But it is not the same thing with regard to very large expenses which are incurred in the establishment of embassies far and wide, practically in all parts of the world. In view of India's new status and position, increase of foreign affairs expenditure may be probably necessary but it may be criticised that cost should not be out of proportion to the benefits received. As a result of all these the Government has not been able to balance its budget during these recent years. Deficit financing has

become a regular feature. The quality of money increased, and other things remaining unaltered, prices went up still further.

Our trouble seems to arise from two sets of factors. They are in large amounts of spendable income in the hands of war profiteers and black market dealers which have not been yet mopped up. Secondly, the Government must aim at a balanced budget. For, meeting the first problem we can only suggest vigorous investigation of tax-evasion cases and re-imposition of controls and the system of rationing. Besides recontrol there is also the necessity to remove transport bottlenecks in order to facilitate the movement of commodities from surplus areas to deficit areas.

For meeting the second problem, some relief may be obtained from heavier taxation of non-essential and luxury goods. This tax on luxury goods should be imposed in such a manner as not to hinder the incentive to business enterprise and saving. More reliance should be placed on curtailments of superfluous expenditure both in civil and military departments as well as in foreign affairs department without impairing efficiency.

Prosperity presupposes plenty. This means that production must be stepped up. This requires the co-operation of all the factors of production and the prevalence of favourable economic climate. Labour must be given a fair deal. Export trade control should be liberalised. Commercial stipulation and the problem of sterling securities should be based on such principles which will be helpful to combat inflation.

These are some of the suggestions offered for fighting inflation which is causing widespread distress among the poor and lower middle classes of this country.

ROBERT LOUIS STEVENSON

NEELA SEN—Third year, Arts.

Thin-legged, thin-chested, slight unspeakably
Neat-footed and weak-fingered : in his face—
Lean, large-boned, curved of beak and touched with race
Bold-lipped, rich-tinted, mutable as the sea.
The brown eyes radiant with vivacity,
There shines a brilliant and romantic grace
A spirit intense and rare with trace on trace
Of passion and impudence and energy"—

It was one summer evening that I got acquainted with him. Something at the first moment caught up with the trend of my mind and I liked him at the first instance. I was not big enough to find out what it

was that appealed to me most; afterwards it became too obvious for it was the life-beat which throbbed under every piece of his work and achievement and practically had his whole life in its embrace. And it was his undaunted spirit. I am speaking about Robert Louis Stevenson.

Born in November 1850 in Edinburgh, Robert Louis was something of a prodigy. He was a born genius from some point of view and regarding some he raised himself on the platform of genius by his rare assiduity. Here too, we read the same tale. That spirited soul made itself felt above everything else. I have said he was a prodigy—in the sense that, that wonderful person had something or other to contribute to the different branches of English literature—in essay writing, in fiction and in verse of these three, apparently verse-composition came naturally to him; yet strange enough he takes his place among the literary personnel of the past as an essayist Strange because Stevenson became a successful essay-writer after years of practice copying eminent writers like 'a sedulous ape' in his language. He tells us about that in one of his essays, confiding in his usual disarming way. Born during the Victorian age when English literature was on its apex, Stevenson found and secured his place amongst the glorious suns of the universe of literature of that period by his golden magic wand—his indomitable spirit helped him through years of unceasing copying. Here was no born genius, but a genius made—if it could be so. It is nearly fifty-five years ago when Robert Louis lived. Time has performed its duty and Stevenson lives in people's mind not as a fiction writer, nor as a verse-composer but as a perfect essayist. But to a number of people he is considered best for his wonderful verses —and I, too, am included in that category.

Not a good many of those poems did he write. Two or three small books containing lively verses were written specially for little children. But they suffice to present a vivid picture of his childhood days before our mind's eye. This extraordinary man had gone through a very unnatural childhood. Being very weak in constitution, he developed lung-trouble from his early boyhood. So, instead of leading a normal happy-go-lucky life he had to be confined to bed most of the time. But his stoical nature remained the same throughout his life.

Naturally, many of the verses deal with a sick child in bed playing with his toys—

"When I was sick and lay a-bed
I had two pillows at my head,
And all my toys beside me lay
To keep me happy all the day."

Or, when the sick child is tired of being in bed—

"I should like to rise and go
Where the golden apples grow;
Where below another sky
Parrot islands anchored lie,
And watched by cockatoos and goats
Lonely Crusoes building boats"—

Lying all day in bed the child dreams of growing up—

"When I am grown to man's estate
I shall be very proud and great
And tell the other girls and boys
Not to meddle with my toys"—

The poor child grew to dislike bed time being too much familiar with his bed.—It is something very unpleasant,—

"When the bright lamp is carried in,
The sunless hours again begin ;
O'er all without, in field and lane
The haunted night right returns
again"—

But he is never without his courageous heart. His brave soldierly spirit shows itself in the following lines—

"Must we to bed indeed ? well, then
Let us arise and go like men,
And face with an undaunted tread
The long black passage up to bed."

Under that fragile frame of his, Stevenson had a bold, adventurous spirit and a boyish heart. Fired by his colourful imagination his spirit has found its way through his writings. The young pirate with his companions has set out on an adventure—

' Where shall we adventure today that
we're afloat
Wary of the weather and steering by a star
Shall it be to Africa, a-steering of the boat
To providence, or Babylon or off to
Malabar ?"

Sometimes the child is the sole one on embarkation at night—

"My bed is like a little boat ;
Nurse helps me in when I embark ;
She girds me in my sailor coat
And starts me in the dark"—

The chief aim of Stevenson's life was to become a soldier. But his weak health did not permit him to be so. So he had to take to writing. His childhood games showed his soldierly tendency too clearly. Here the young soldier goes a-marching—

"Bring the comb and play upon it
Marching here we come !
' Willie cocks his highland bonnet
Johnny beats the drum.
Mary Jane commands the party
Peter leads the rear
Feet in time, alert and hearty
Each one a Grenadier !"

The soldier is now very much active,—

"Now with my little gun I crawl
All in the dark along the wall
And follow round the forest truck
Away behind the sofa back."

Besides these verses written for children, Stevenson wrote some others, dedicating them to the persons he came in contact with in his life. Those were written in the true language of golden sincerity. It is what makes them invaluable. Some of the verses he set to music—tunes by famous composers. Some he wrote in Scotch.

It seemed that providence had sealed for him the life of an invalid as if to counterbalance his over-energetic spirit It was nothing but an irony of fate that he never got a chance of experiencing the life he craved to lead. All his life was a search for health and he bore his duty like a true soldier. Yet in unguarded moments the cry of his heart rang out through every line of his poem—

"Give to me the life I love
Let the love go by me,
Give the jolly heaven above
And the by-way nigh me.
* * *
Wealth I ask not, hope nor love
Nor a friend to know me
All I ask the heaven above
And the road below me."

THE PELLUCID SUN*

SRI PIYUSH KANTI CHATTERJE, B.A. (*Ex-student*)

The pellucid sun of the first day
Asked the Life that took its birth
Who are you ?
What's your name ?
Reply there was none.
Time is fleeting and years roll on.
In a crimson evening calm and serene and silent
Beyond the far-stretch'd western ocean-beach
The setting sun of long drawn and fatigued day
Utter'd the last question :
Who are you ?
What's your name ?
Reply there was none.

**Translated from Rabindranath's "Pratham diner suryya" in "Ses-Lekha"*

OUR UNION

Morning Department

The present Students' Union of the Girls' Section was formed at the end of November last, with Prof. Miss Arundhati Sen as President and Prof. Miss Aruna Sen Gupta as Vice-President. We are highly delighted that they have agreed to be the President and the Vice-President of the Union.

Among the activities of our Union, we must give the foremost place to Netaji's Birthday celebration. We celebrated the Birthday of our beloved Netaji on the 23rd January, jointly with the other departments. Justice N. C. Chatterjee presided over the function. We are thankful to him for his presence.

As regards our atheletic activities, we held our Annual College Sports on the 29th January, 1949. Mrs. Shovana Majumdar kindly presided over the function and gave away the prizes. The 3rd year class won the Team Championship. Cheers for the winners !

We held a meeting on the first death anniversary of Mahatma Gandhi to express our heart-felt devotion and love to Mahatma Gandhi.

As regards our social activities, this year we celebrated the Saraswati Puja in co-operation with the other departments amidst great festivity and with success. I thank those who volunteered their services on the occasion.

We greeted the outgoing 2nd year and 4th year students with hearty congratulations. Prof. B. Ghosal presided over the function which was held on the 13th March, 1949.

The Union organised a steamer trip to the Sibpur Botanical Garden on the 20th March. Many students and professors of the College joined the picnic and made it a grand success. We express our cordial thanks specially to Professor Arundhati Sen, Professor J. C. Banerjee and Professor Paresh Sen, for the trouble they took to make it so successful.

As regards our Common Room, I am glad to report that many new books have been added to the existing stock and the choice of books is admirable.

Before I end, I express my sincere thanks to all the workers of the Union for their hearty co-operation and support in the discharge of our duties. I also express my sincere thanks to our friends who have helped us to achieve our ideal.

SABITA SEN,
General Secretary

OUR UNION

Day Department

Brothers,

Before I proceed to give the general report of the College Union under my tenure of office as the General Secretary of the same Union, I must record my thanks to Professor Sibnath Chakravarty and Ajit Sen of the outgoing Union for making a clean and smooth transfer of office possible.

Cultural Functions (Secretary Amal Sankar Bhadury):

NETAJI'S BIRTHDAY:

The year began for our Union with the celibration of the 23rd January, Netaji Subhas Chandra Bose's birthday under the patronage of such distinguished guest-president as Hon'ble Justice Nirmal Chandra Chatterjee and Mr. Sukumar Sen Gupta of I. N. A. fame. Justice Chatterjee gave us an emotional and stirring speech on Netaji. Sukumar Sen Gupta gave accounts of Netaji in South-East Asia and Japan. Reba Sen, also a guest of the Union and more well-known for her connection with Jhansi Rani Brigade stressed on the many-sided genius and personality of Netaji.

GANDHIJI'S DEATH CEREMONY:

It was on the 30th of January, 1948 that the Father of Our Nation Mohandas Karam Chand Gandhi was bratally done to death by a fanatic's bullets. We observed the day sorrowfully and shamefully. Miss Arundhati Sen half masted the tricolour and Prof Sambhunath Banerjee spoke a few words of grief on Mahatmaji's martyrdom.

SARASWATI PUJA:

As you know hitherto the Saraswati Puja had been quite a problem with previous Union because of some strained relationship between the three departments—Morning, Day and Night of our College. I record with pride that this year we celebrated the puja jointly with the very willing and sympathetic co-operation of all the three departments. It opens a new chapter in the history of co-operation among students and I hope the next Union will try to keep up this tradition of jointly celebrating all functions. My special thanks are due to Miss Sabita Sen, the General Secretary of Morning Department and Srl Ajoy Mazumder, the General Secretary of Night department for making the puja so much worth while.

COMMON ROOM: (Secretary, DIPEN CHATTERJEE)

A table tennis tournament was also held under the direct supervision of our Common Room Secretary Sree Arun Das Gupta and Sree Dilip Choudhury were winner and runner respectively, the prizes being distributed by our Principal Sree Someswar Mukherjee.

DEBATING: (Secretary, AJOY GHOSH)

Our Union Debating Society met for quite a number of times under Ajoy Ghosh, the Debating Secretary. Cultural and Educational topics were chosen as subjects and interesting maiden speeches delivered by the students.

FLAG DAY:

Our students observed Flag day for Jadavpore T. B. Hospital and R. W. A. C. by going out in the streets and appealing the public for fund.

Before I end this summary report of Union activities under my term of office as General Secretary of the Union I convey on behalf of the Union my felicitations to Dr. Prof. Bijon Behari Bhattacharyya for receiving the Doctorate of Philosophy from Calcutta University. We are sorry to report that three of our old professors Amullya Dutto of Mathematics, Amlan Dutta of Economics and Phani Mukherjee of English have left us.

We worked hard to arrange a social gathering on the 10th April 1949, and our efforts were crowned with success.

KAMAL GHOSH,
General Secretary

OUR ATHLETIC CLUB

Day Department

It would be less than frank not to acknowledge the sincerity of my colleagues of the Asutosh College Athletic Club for the valuable services they rendered throughout my term of office. It is astonishing indeed that a private institution to which we belong, has been able to maintain reputation in all the Intercollegiate games. It has been able to do so only for the encouraging sporting spirit of everyone of my young friends and also for the sincere co-operation of the college staff. It is significant here to make my readers acquainted with the vital spirits of my competing friends in all the functions they had.

HOCKEY:—We had the triumph of vigour and energy to create a sensation in the hearts of others by winning the Asutosh Choudhury Cup by defeating St. Xaviers College which was organised by the Bengal Hockey Association. But we were rather unlucky to lose the Dr. S. R. Dasgupta Cup to B. E. College organised by the Calcutta University Hockey Club.

RECENT ADDITIONS TO THE LIBRARY

BASKET :—In basket we lost to Postgraduate in the final game by a solitary point after giving a gallant fight.

CRICKET :—In Cricket we lost the Principal S. Roy Memorial Shield to Vidyasagar College in final. Though Vidyasagar College bears a traditional reputation in cricket and seven among their players represented University team and some one even Bengal, yet my friends did not lose their spirit to fight till finish.

FOOT-BALL :—We became the champion of the Inter-Collegiate foot-ball league last year by defeating the R. G. Kar Medical College by two goals to nil in the final game which was organised by the Calcutta University Athletic Club and we also won the Elliot Shield for the first time in our life by defeating Surendra Nath College by a solitary goal which was organised by the Indian Foot-ball Association.

ANNUAL SPORTS :—Many promising athletes joined the annual sports and showed their merits. Among the competitors, my best thanks to Madhu Sudan Ghosh who became the individual champion.

It is interesting here to mention the names of those who by dint of their merit represented Bengal and Calcutta University team in Hockey, Cricket, and Football. Sarwan Singh, the full back of College Hockey team represented Bengal in National Hockey championship last year. Sunil Dasgupta and Biren Chatterjee represented the university cricket team last year. This year Subrata Das and Biren Chatterjee represented the versity team. Prafulla Guha, Captain, College foot-ball team, Biren Chatterjee, Samir Roy and Manish Sarkar represented versity team in soccer game last year.

It is indeed encouraging that with ut being allowed full facilities in every aspect of games (as seen in other colleges) we rendered our services faithfully and sincerely. Thanks to our Principal for kind consideration he did in giving three Bleasures to three of my friends namely A. Sinha (Ex. Games Secretary), P. Guha (Foot ball Capt), and S. Sarkar (Hockey Capt.) but we expected a little more liberalisation in his consideration. It would be unfair not to msntion here the kind grant of our Principal in giving twelve crests to the Elliot Shield Winners. Before concluding, I thank my friends who remaind always beside me in every critical moment of my activity. We are looking forward to more liberal facilities and co-operation from our authority. Traditional education as it is bestowed on us in a lack-lustre fashion must be a bit different from sports which must be adequately revived and revitalised in the heart of the young.

DHIREN GANGULI,
Games Secretary

RECENT ADDITIONS TO THE LIBRARY

Bertrand Russel—Sceptical Essays.
J hn M. Ewing—Understanding yourself and your society
Girindrasekhar Bose Everyday psycho-analysis.
Bertrand Russell—Marriage and morals
J. G Jennings, ed —Vedantic Buddhism of the Budha.
Paul Arthur Schilpp, ed —Philosophy of Bertrand Russell.
Boulding—Economic Analysis.
Edward Heimann—History of economic doctrines.
Parimal Kumar Roy—Agricultural Economics of Bengal, Pt. I.
Bimal Chandra Ghosh & Bimal Chandra Sinha—Planning for West Bengal,
Rangnekar—Imperfect competition in International Trade.
Bertrand Russell—Power (a Social Analysis).
Sibnath Chakravarty—Introduction to Politics.
S. C Bose—Damodar Valley Project
J. K. Mehta—Advanced Economic Theory.
Alvin H. Hausen—Economic Policy and full employment.
Haroll J. Laski—Liberty in the modern state.
B. F. Catherwool—Basic Theory of distribution,
George J Stigler—Theory of Price.
George J. Stigler—Production and Distribution.
Carleton Kemp Allen—Democracy and the Individual.
A. V. Dicey—Introduction to the study of the law of the Constitution.
A. C. Pigou—Income, Introduction to Economics.
G. D. H. Cole—Intelligent man's guide to the Post-war.
Yearbook of the United Nations.
Statesman's Year Book—1948.
Harold Cramer—Mathematical Methods of Statistics.
L. Poutrajagiu—Topological Groups.
Luther Pfahler Eisenhert—Introduction to differential geometry.
David Vernon Widder—Laplace Transform.
Aurel Wintner—Analytical foundations of cefestial machanics.
Edward Jones Meshane—Integration.
Madhusudan Sarkar & Benode Behari Dutt—Astronomy
Briggs and Bryan—Tutorial Algebra, 2 vols.
Ralph R. Lawrence—Principles of a'ternating Current.
Alexander Wood - Accoustics.
F. J. Hoare—Text Book of Thermodynamics.
Burton—Text Book of Light.
Hadley—Magnetism and Electricity.
K. P. Ghosh—Text book of Optics, 2 vols.
Whitemore Organic Chemistry.
Scott Standard methods of Chemical Analysis, 5th ed ; 2 vols.
Glasstone—Physical Chemistry, 1948.
Prutton & Maron—Physical Chemistry.
Blatt, ed —Organic Synthesis, 2 vols.
Schmidt—Organic Chemistry.

R. L. Knights—Dictionary of Genetics.
Robert H Lowie—Introduction to cultural anthropology.
J. M. Lowson & Birbal Sahani—Text Book of Botany, edition for India, Pakistan, Ceylon.
A Fames—Plant anatomy, 2nd ed.
Chester—Nature and Prenention & plant diseases.
A. D. Jmnes—General text book of Entomology.
Darrel Hang Davis—Earth and Man.
Carey Cromis—Down to Earth.
W. Somerset Maugham—Creatures of circumstances.
Do Razor's Edge
Do Of Human Bondage.
Eugene O'neill—Nine Plays.
Fyoder Dostoevsky—House of the dead.
John Earle—English prose, its element, history and usage.
Buddhadeva Bose—An acre of green grass.
Iris Leves on Gower—Face without a frown.
H. E. Bates—Purple Plain.
Douglas Reed—Prophet a home.
Walter de la Mare—Best stories of Walter de la Mare.
Daphne du Maurior—Loving Spirit.
W. H. Auden—Orators (An English Study).
J. Russel Smith & M. Ogden Phillip—Industrial & Com. Geography.
C. Strickland—Deltaic Formation.
Andre Guibant—Tibetian Venture, Tr. by Lord Sudley.
Vector Kravchendo—I Chose Freedom.
Johan C. Campbell—United States World affairs 1945—47.
Dwight D. Eisenhower—Crusade in Europe.
Jawaharlal Nehru—Mahatma Gandhi.
Will Durant—Story of Civilization.
Radha Kumud Mukherjee—Gupta Empire.
Ernuse Mackay—Early Indus Civilization.
Walter Fitzerald—New Europe ; 2nd ed.
Philip Lake—Physical Geography.
Erwin Raisz—General Cartography.
Encyclopaedia Britinnica World Atlas.
Walter Lippman—U. S. Foreign Policy.
Winston Churchill—Victory (War Speeches).
Do Onwards to Victory (War Speeces) 2nd Ed.
Do End of the beginning (War Speeches) 3rd Ed.

মোহিতলাল মজুমদার—স্মরগরল।
হেমেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত—ভারতের বিপ্লব কাহিনী ১ম খণ্ড।
তারাপদ ভট্টাচার্য্য—ছন্দোবিজ্ঞান।
মোহিতলাল মজুমদার—কবি শ্রীমধুসূদন।
মোহিনীমোহন মুখোপাধ্যায়—সোফোক্লেস।
সুরেন্দ্রনাথ বিদ্যারত্ন—জৈন ও হিন্দু।
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর—রবীন্দ্ররচনাবলী, ষড়্বিংশ খণ্ড।
অসিতকুমার হালদার—ঋতু সংহার।
হরপ্রসাদ শাস্ত্রী—বৌদ্ধ ধর্ম্ম।
সুরেন্দ্রনাথ সেন—অশোক।
মণীন্দ্রনাথ বসু—বাঙ্গালীর পরিচয়।
কান্তিচন্দ্র ঘোষ—রোবাইয়াৎ-ই-ওমর খৈয়াম।
" " " হাফিজ।
নলিনীনাথ দাশগুপ্ত—বাঙ্গালায় বৌদ্ধ ধর্ম্ম।
সাধনকুমার ভট্টাচার্য্য—নাট্যসাহিত্যের আলোচনা ও নাটকবিচার।
মণীন্দ্রচন্দ্র সমাদ্দার—প্রবাসী বাঙ্গালীর কথা।
প্রবোধচন্দ্র সেন—ধর্মবিজয়ী অশোক।
কৃষ্ণাহাতি সিং—ছায়া মিছিল।
বীণা দাস—শৃঙ্খল ঝঙ্কার।
হেমেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত—বাঙ্গালা সমাজের ইতিবৃত্ত।
কস্তুরচাঁদ লালওয়ানী—অর্থশাস্ত্রের রূপরেখা। ১ম খণ্ড।
রাধাকমল মুখোপাধ্যায়—বিশাল বাঙলা।
হরিদাস দাস—শ্রীশ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণব সাহিত্য।
ক্ষেত্রপাল দাস ঘোষ—আমাদের শিক্ষা।
প্রমথনাথ বিশী—রবীন্দ্র নাট্য প্রবাহ।
শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়—বাংলা উপন্যাস।
শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়—ইংরাজী সাহিত্যের ইতিহাস।
সুহৃদচন্দ্র মিত্র—মনঃ সমীক্ষণ।
মন্মথমোহন বসু—বাংলা নাটকের উৎপত্তি ও ক্রম বিকাশ।
সুকুমার সেন—বিদ্যাপতি গোবিন্দ ও গীতি ত্রিংশতিকা।
लक्ष्मीबाई (झांसि कि राणी)—वृन्दावनलाल वर्मा।
तुलसीदास—चन्द्रबली पाण्डे।
भिखारिणी—विश्वम्भरनाथ शर्मा।
रस, अलङ्कार और पिङ्गल—रासबिहारी शुक्ल।

P. C. B.

ASUTOSH COLLEGE ESTD. 1916 LIBRARY